দ্বিতীয়

চরিতাষ্টক।

শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা ;

১১নং সিমলা ষ্ট্রীট, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত এইচ, এম, মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানির

দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৬ সাল।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

সূচী।

দ্বিতীয়

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

এই সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিতের জীবনবৃত্ত সংগ্রহের কোন উপায় নাই। উঁহার চরিত সম্বন্ধে কোন পুস্তকাদি নাই এবং তদ্বিষয়ে অধিক পরিমাণে গল্প করিতে পারেন এরূপ প্রাচীন লোকও, এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক যত্নে যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ চরিতবৃত্তান্ত না হইলেও উহাদ্বারা উক্ত আচার্য্যের বিষয় অনেকাংশে অবগত হওয়া যাইতে পারে।

ইনি, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র এবং বর্দ্ধমান রাজ চিত্র সেনের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কলিকাতার যোড়বাঙ্গালাস্থিত কোন দেবমন্দিরে সংযোজিত প্রস্তর ফলকে একটী সংস্কৃত কবিতা খোদিত ছিল। এবং ঐ কবিতার নিম্নে ১১৫৩ সাল লেখা ছিল। তাঁহার প্রপৌত্রের নিকট শুনা গিয়াছে যে,

ঐ কবিতাটী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের রচিত। যদি ইহা সত্য হয়, এবং প্রস্তর ফলকে লিখিত সাল কবিতা রচনার সময় মনে করা যায়, তাহা হইলে স্থূলতঃ তাঁহার জীবিত কালের একরূপ নির্ণয় হইতে পারে। যে বয়সেই কবিতাটী রচনা করিয়া থাকুন, তিনি বাঙ্গালা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উপরি-উক্ত প্রমাণানুসারে সহজেই এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ১২৭০ সালের মহাঝড়ে প্রস্তর-ফলক বহুধা ভগ্ন হওয়ায় কবিতার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারা যায় নাই। আপাততঃ ইহা অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মরূপে তাঁহার জীবিত কালের সময় নিরূপণ করিবার উপায় নাই। হুগলী জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত গুপ্তপল্লী গ্রামে অতি সম্ভ্রান্ত শোভাকর বংশে বাণেশ্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। রাম দেবের দুই স্ত্রী, দুই স্ত্রীতে তাঁহার তিন সন্তান হয়। প্রথমার গর্ভে রামনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে বাণেশ্বর ও রামকান্ত। রামকান্ত জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই বটে; কিন্তু শুনা যায় বিষয় বুদ্ধি, বাকপটুতা এবং রসিকতা বিষয়ে তিনি একজন প্রধানের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তাঁহার বাকপটুতা বিষয়ক দুই একটী কথা যথা স্থানে বলা যাইবে।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

বাণেশ্বর কত বয়সে বিদ্যারম্ভ করেন, কতদিন বিদ্যালোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন এবং কোন্ কোন্ শাস্ত্রের কত দূর কিরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এ সকলের যথার্থ বিবরণ দুষ্প্রাপ্য। তবে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, তিনি পিতার নিকট শিক্ষারম্ভ করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে অসাধারণ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিষয়িণী ক্ষমতানুসারেই শিক্ষা-সাধনের তারতম্য হইয়া থাকে। বুদ্ধি; মেধা, শ্রমশক্তি প্রভৃতি গুণগ্রাম, যাহার যত অধিক, সে তত-অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণে কৃতকার্য্য হয়। এই কারণে বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে, কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়, কাহাকে শীঘ্র, কাহাকে বা বিলম্বে শিখিতে দেখা যায়। যে বিষয় শিখিতে সচরাচর যত শ্রম ও সময়ের প্রয়োজন, কাহাকে অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রম ও সময়ে সেই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখিলে সামান্য লোকে সেইরূপ কৃতকার্য্যতাকে দৈব ঘটনা মনে করে। বিশেষতঃ লোক সাধারণের প্রকৃতিই এই যে, কোন ব্যক্তিতে একটু কিছু অসাধারণ দেখিলেই তাহাতে বস্তু (১) আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। বোধ হয়, এই কারণেই কালিদাস, শ্রীধর, বাণেশ্বর প্রভৃতি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বিদ্যা,

(১) দেবাবেশ।

দৈবলব্ধ বলিয়া লোকে খ্যাত হইয়াছে। এইরূপে দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত কারণের অনুসরণ না করাতেই পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের শিক্ষা বিবরণ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বাণেশ্বরের দৈব্য বিদ্যার নিম্নলিখিত জনশ্রুতি পাওয়া যায়।

ঘরে ঘরে মন্ত্রগ্রহণ করা গুপ্তপল্লীর শোভাকরবংশের চিরাচরিত রীতি। কিন্তু বাণেশ্বর স্বপ্নে এইরূপ আদিষ্ট হন যে, "তুমি খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী * * বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট দক্ষিণ প্রয়াগের(২) গঙ্গাতীরে ** দেবতার মন্ত্রগ্রহণ করিবে"। কৃষ্ণনগর নিবাসী উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই দিন রজনীতে উহার বিপরীত প্রকার স্বপ্ন সন্দর্শন করেন। এই স্বপ্নানুসারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাণেশ্বর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া জপ আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর জপের পর তিনি সিদ্ধি লাভ করিলেন। এই সিদ্ধি নিবন্ধনই তিনি অসাধারণ বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন।

গুপ্তপল্লীর যে ঘাট "কোটাবাড়ীর ঘাট" বলিয়া খ্যাত, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের নিবাস তাহারই নিকট ছিল। বোধ হয়, গুপ্তিপাড়ার ঐ পল্লীতে বিদ্যালঙ্কারই সর্ব্ব প্রথমে কোটা করেন। যে হেতু জনশ্রুতি এইরূপ যে, তাঁহার কোটার নামানুসারেই, উক্ত ঘাট কোটাবাড়ীর ঘাট বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

(২) হুগলীর অন্তর্গত ত্রিবেণী।

বাণেশ্বরের বাল্যকালের এক কৌতুকাবহ গল্প প্রসিদ্ধ আছে। এই শোভাকর বংশে বাণেশ্বরের কিছু পূর্ব্বে মথুরেশ নামক একটী বালক ছিল। এই বালকটী পাঠে অনাবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়াইত। তাহার পিতা সর্ব্বদাই তাহাকে তাড়না করিতেন। একদিন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "তুমি আজ মথুরেশকে ছাই খেতে দিও।" সাধ্বী পত্নী, পতির আজ্ঞালঙ্ঘন পাপ মনে করিয়া সেই দিন মথুরেশের ভোজন পাত্রের এক পার্শ্বে এক খানি অঙ্গার দিয়াছিলেন। মথুরেশ ভোজন কালে তাহা জানিতে পারিয়া জননীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জননী প্রথমতঃ অনেক ছল করিয়া পরে প্রকৃত বিষয় প্রকাশ করিলেন। মথুরেশ তখনি ভোজনে বিরত হইয়া গৃহ-বহির্গত হইলেন। বিদেশে গিয়া যে রূপেই হউক, নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া বহু বৎসর ভ্রমণের পর একদিন শ্যামাপূজার রজনীতে সন্ন্যাসীর বেশে নিজ গৃহে উপস্থিত হয়েন। প্রতিমার সম্মুখ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে শ্যামাশক্তির স্তবাত্মক অষ্টাধিক শত সংস্কৃত শ্লোক (৩) আবৃত্তি করিলেন।

---

(৩) এই অষ্টোত্তর শত শ্লোক অতি উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তি-সম্পন্ন। শ্যামা কল্পলতিকা নামে খ্যাত হইয়া অদ্যাপি ইহা পুস্তকাকারে বর্ত্তমান আছে।

ক্ষণকাল পরে,—"যদি কেহ শ্লোক কয়টী লিখিয়া রাখিত"—এইরূপ বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসীর স্তবপাঠে সকলেই মোহিত ও আর্দ্র হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার আক্ষেপে সকলেই আক্ষিপ্ত হইলেন। ঐ সময়ে একটী বালক নিজ পিতার সহিত সন্ন্যাসীর নিকট দণ্ডায়মান ছিল। সে—"আমি সব শিখিয়াছি" বলিয়া সমুদয় অবিকল পাঠ করিল। বালকের পিতা তাহা শুনিয়া বলিলেন—"কালে বাণুও পণ্ডিত হবে"। এই বাণুই ভবিষ্যতে এই প্রবন্ধোক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বলিয়া খ্যাত হয়েন। যাহাহউক যিনি এতাদৃশ শ্রুতিধর পুত্রের প্রতিও তাদৃশ ব্যঙ্গোক্তি করেন, সেই রামদেব তর্কবাগীশ স্বয়ং কত বড় মেধাবী লোক ছিলেন; ইহা দ্বারা তাহারও কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে। শুনা যায়, রামদেব সমস্ত মহাভারত স্বহস্তে লিখিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

বাণেশ্বর বয়ঃ প্রাপ্ত ও পণ্ডিত হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার একজন আদরণীয় সভাসদ হইয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান করিতেন। এই স্থানে তিনি দীর্ঘ কাল ছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণও তাঁহার যথেষ্ট আদর ও সম্মান করিতেন। তিনি কলিকাতার শোভাবাজারে বিদ্যালঙ্কারের একটী বাড়ী করিয়া দেন। ঐ বাড়ী বর্ত্তমান

আছে এবং উহাতে তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি কলিকাতার মধ্যে মহা সমাদরে বাস করিতেছেন। এই বাড়ীর বাস সম্বন্ধেই কলিকাতার বিখ্যাত বসাকদিগের বাটীতে কোন শ্রাদ্ধীয় সভায় বিদ্যালঙ্কারের গমন হয়। এই শূদ্র সংসর্গ প্রযুক্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি কিছু অভক্তি প্রকাশ করেন। রাজার এই অভক্তিভাব, বাণেশ্বর যে মুহূর্ত্তে জানিতে পারিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানে প্রস্থান করেন। বর্দ্ধমানরাজ চিত্রসেন তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া নিজ সভায় প্রধান আসন প্রদান করিয়াছিলেন।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইহলোকে নরত্বই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ, নরত্ব অপেক্ষা বিদ্যা, এবং বিদ্যা অপেক্ষা কবিত্ব দুর্লভ। কিন্তু শক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভতম। চিন্তার উপযুক্ত রূপে অবকাশ পাইলে অনেকেই উৎকৃষ্ট ভাবশুদ্ধ কবিতাদি রচনা করিতে পারেন। কিন্তু বিষয় দর্শন মুহূর্ত্তেই অক্লেশে অনুপম শ্লোকাদি রচনা করা, সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। ঐ ক্ষমতাকেই শক্তি বলে। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারে এই শক্তি প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইত। যে সময়ে যে কথা বলা উচিত, যিনি তদ্দণ্ডেই ঠিক সেইরূপ কথা বলিতে পারেন, লোকে তাঁহাকে উপস্থিত বক্তা বলে। বাণেশ্বরের উপস্থিত বক্তৃত্ব অধিক-

ত্তর প্রশংসনীয়। কারণ তিনি উৎকৃষ্ট কবিতা দ্বারা ঐরূপ উপস্থিত বক্তৃতা করিতে পারিতেন। বোধ হয়, উপস্থিত কবিত্ব বিষয়ে এ দেশে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারই অদ্বিতীয় ছিলেন।

কোন সময়ে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তরণীযোগে ভাগীরথী বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়াই রাজা বিদ্যালঙ্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "মহাশয়, ভাগীরথীকে এই স্থানে এত মন্দগামিনী দেখাইতেছে কেন?" বিদ্যালঙ্কার। "তাহার কারণ আছে, শ্রবণ করুন" বলিয়া নিম্ন লিখিত কবিতাটী বলিলেন।

"সগরসন্ততিসন্তরণেচ্ছয়া
প্রচলিতাতিযবেন হিমালয়াৎ।
ইহ মন্দমুপৈতি সরস্বতী-
যমুনয়োর্ব্বিরহাদিব জাহ্নবী॥"

ভাগীরথী সগর সন্তানগণের উদ্ধার বাসনায় সরস্বতী ও যমুনা নাম্নী সখীদ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয় হইতে অতিবেগে গমন করিতেছিলেন, এই স্থানে ঐ সখীদ্বয়ের সহিত বিরহ নিবন্ধন জাহ্নবীর এতাদৃশী অবস্থা হইয়াছে। ফলতঃ নদী যত সম ভূমিতে যায় ততই মন্দবেগ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ত্রিবেণী হইতে সরস্বতী ও যমুনা নাম্নী শাখা নদী দুইটী ভিন্ন ভিন্ন

দিকে গমন করায় উক্ত স্থানে ভাগীরথীর ঐরূপ অব-স্থাই সম্ভব। কি! আশ্চর্য্য শক্তি! কি অদ্ভুত কবিত্ব! এমন বিশুদ্ধ ভাব সমন্বিত ললিত কবিতা, দীর্ঘ কাল চিন্তার পর সুকবির মুখ হইতে নির্গত হয় কি না সন্দেহ।

অপর কোন সময়ে কৃষ্ণ চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিতা কালীর হৈমকিরীট অপহৃত হয়। তখন করচালনা গণনায় লোকের বিশ্বাস ছিল। ঐ প্রক্রিয়ায়, "চৌরোহরঃ" এই পদ লিখিত হইল। তদনুসারে সেই কালী পূজকের ভ্রাতা হর নামক কোন ব্যক্তির প্রতি সন্দেহ করা হইল। সে চুরি করিয়াছিল কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই; কিন্তু রাজ দণ্ড ভয়ে সে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। কোন উপায় না দেখিয়া অন্যতম সভাসদ বাণেশ্বরের শরণ লইল। তিনি শরণাগত ব্রাহ্মণের রক্ষায় কৃত-সঙ্কল্প হইয়া তাহাকে অভয় দিয়া বিদায় করিলেন।

বিদ্যালঙ্কার প্রত্যহই রাজসভায় গিয়া থাকেন। এক দিন সৈনিক পুরুষেরা চৌর্য্যাপরাধী হরকে রাজ সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বিচার প্রার্থনা করিল। বিদ্যা-লঙ্কার যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাণ করিয়া উপস্থিত ঘটনার সবিশেষ বৃত্তান্ত সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেম। সভ্যগণ উত্তর দিলেন। তিনি মুদিত নেত্রে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমার

বোধ হইতেছে এ নির্দ্দোষী, যে ব্যক্তি কিরীট চুরি করিয়াছে আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি, শ্রবণ করুন।” বলিয়া নিম্ন লিখিত কবিতাটী আবৃত্তি করিলেন ;—

“জলে লবণবল্লীনং মানসং তন্মনোহরম্।
মনোজিহীর্ষয়া দেব্যাঃ কিরীটং হরতে হরঃ॥”

লবণ জলে যেরূপ লীন হয়, মনোহর কিরীটে দেবীর মন সেইরূপে লীন হইয়াছিল। দেবীর মনোহরণাভিলাষী শূলপাণি দেখিলেন, তাঁহার মন কিরীটেতে লগ্ন হইয়া আছে। অতএব তিনি কিরীট শুদ্ধই অপহরণ করিয়াছেন। পরম ভক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র, কবিবরের মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিলেন এবং মানব হরকে নিষ্কৃতি দিলেন।

এই উপস্থিত শ্লোকটী একজনের বিপদুদ্ধার মূলক হওয়াতে ইহার শত গুণ গৌরব প্রকাশ পাইতেছে।

একদা রটন্তী পূজার রজনীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিজ বাটীতে কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া “কিমদ্ভুতং” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উক্ত পদান্ত একটী কবিতা বলিলেন। সে কবিতাটী এই ;—

“শিবস্য নিন্দয়া যয়া ত্যজদ্বপুঃ স্বকীয়কম্।
তদংঘ্রি পঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতম্॥

যিনি শিবের নিন্দা শ্রবণে আপনার শরীর ত্যাগ

করিয়া ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার পদদ্বয়, সেই শবাকার শিবে সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহাই অদ্ভুত। ঐ ব্যক্তি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি কোন সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজ সভা ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন। হঠাৎ বিনা আহ্বানে তাঁহাকে গৃহাগত দেখিয়া রাজা "কিমদ্ভুতং" শব্দ প্রয়োগ করেন। তিনি যে কি নিমিত্ত বিনা আহ্বানে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহার পর ঐ স্থানে থাকিলেন, কি বর্দ্ধমানে গমন করিলেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র বোধ হয় যে, তিনি কৃষ্ণনগর রাজ সভায় কেবল সম্মান লাভের প্রত্যাশায় থাকিতেন না। রাজার গুণগ্রাহিতা ও প্রণয় প্রকাশে বাধিত হইয়াছিলেন। অপর কৃষ্ণনগরের ন্যায় বর্দ্ধমানে তাঁহার গুণের গৌরব হয় নাই। এই সকল কারণেই তিনি বর্দ্ধমান হইতে কৃষ্ণনগরে আসিয়া ছিলেন। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে তিনি এই আগমনের পর কৃষ্ণনগরেই ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করাও অসঙ্গত হয় না। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের কৃষ্ণনগরে পুনরাগমন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, নিম্নলিখিত গল্পটী তাহার পোষকতা করিতেছে।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই, রাজেন্দ্র বাহাদুর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গাত্রোত্থান করি-

তেন। তাহাতে নবদ্বীপের কতকগুলি বিখ্যাত অধ্যাপক, গুরু পুরোহিত ব্যতীত আর কাহাকে দেখিয়াই রাজার গাত্রোত্থান করা উচিত নহে, বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্ররায় উত্তর করেন, "বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে আমার গুরু বলিলেও হয়, পুরোহিত বলিলেও হয়।"

বাণেশ্বরবিদ্যালঙ্কার একবার পুরুষোত্তমে রথযাত্রা-দর্শনে গিয়াছিলেন। সেই বার রথ হইতে বলরাম ঠাকুরের বিগ্রহ ভূপতিত হয়। তদ্দর্শনে তৎকালীন উড়িষ্যা-রাজ "ঔৎপাতিকং" এই শব্দ উচ্চারণ করেন। বাণেশ্বর, রাজাকে সম্বোধন করিয়া ঐ শব্দ অবলম্বনে নিম্ন-লিখিত কবিতাটী বলিলেন ;—

"ঔৎপাতিকং তদিহ দেব বিচিন্তনীয়ং
নারায়ণো যদি পতেদথবা সুভদ্রা।
কাদম্বরী-মদ-বিঘূর্ণিত-লোচনস্য
যুক্তং হি লাঙ্গল-ভৃতঃ পতনং পৃথিব্যাম্" ॥

রথ হইতে ঠাকুর পড়া অশুভজনক, রাজা "ঔৎপাতিকং" শব্দ দ্বারা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাণেশ্বর বলিলেন, নারায়ণ কিম্বা সুভদ্রা ভূপতিত হইলে উৎপাত আশঙ্কা করা যাইত ; যাঁহার লোচন কাদম্বরী-মদপানে নিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেই হল-ধরের ভূপতন কোন রূপেই অসম্ভব বা অশুভ জনক

নহে। রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন।

বাণেশ্বর অতি সরল লোক ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, কনিষ্ঠ রাম কান্ত তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ও ক্ষমতা ছিল। তিনি এক দিন কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠকে বলিলেন, "মহাশয়, বিষয় বিভাগ করিয়া দিন, আমি পৃথক্ হইব।" বাণেশ্বর বলিলেন, "ভাই, কি বিভাগ করিব, এ সমুদায় বিষয়ই আমার স্বোপার্জ্জিত, ইহার এক কপর্দ্দকেও তোমার অধিকার নাই। পৈতৃক বিষয়ের মধ্যে এক খানি তৃণাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র কুটীর, উহা ভাগ করিয়া লইতে পার।"

রামকান্ত বলিলেন, "তা কেন হবে। যিনি ইচ্ছা, উপার্জ্জন করুন, একান্নবর্ত্তী ভ্রাতৃ-গণের সকলেই সমান অংশী। অতএব এই সমস্ত বিষয়েরই অর্দ্ধাংশ আমার প্রাপ্য।"

বাণেশ্বর বলিলেন, "সে কেমন কথা! আমি উপার্জ্জন করিয়াছি, তুমি লইবে কেন? আমি কখন অংশ দিব না।" "তবে আমাকে রাজ দ্বারে অভিযোগ করিতে হইল," বলিয়া রামকান্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

কয়েক মাস পরে বাণেশ্বর একদিন নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য গঙ্গাপার হইতেছেন, এমন সময়ে এক জন

শ্মশ্রু ও লোহিত পরিচ্ছদধারী পুরুষ আপনাকে নবাবের পেয়াদা বলিয়া পরিচয় দিয়া খেয়ার নৌকা ডাকিতে লাগিল। মাজী ভয়ে কম্পমান। নবাবের পেয়াদা ডাকিতেছে, কি করে আধাগাঙ গিয়াও নৌকা ফিরাইয়া আনিল। নবাবের পেয়াদা দেখিয়া বাণেশ্বরের বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কাঁপিতেছেন।

নৌকা কূলে লাগিল। পেয়াদা নৌকায় উঠিয়া বাণেশ্বরের দিকে ঘন ঘন তাকাইতে লাগিল। বাণেশ্বর বক্র লোচনে এক এক বার দেখিতেছেন; আর হৃদয়ের খানিক খানিক রক্ত শুকাইয়া যাইতেছে। পেয়াদা হঠাৎ তাঁহার পা ধরিয়া প্রণাম করিল। বাণেশ্বর কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন কি,—মুখে কথা নাই, ভয়ে অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। "তুমি কে? কি জন্য প্রণাম কর" সঙ্কেতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

পেয়াদা কহিল,—"মহাশয়, আমাকে চিনিতে পারেন নাই? আমি আপনার কনিষ্ঠ রামকান্ত। আপনি বিষয়ের ভাগ না দেওয়াতে আমি মুরশিদাবাদে গিয়া নবাব সাহেবের নিকট সমুদায় জানাইয়াছিলাম। তিনি আপনাকে অনুমতি পত্র দিবার জন্য পেয়াদা পাঠাইবার মানস করিলেন; কিন্তু তখন তথায় পেয়াদা উপস্থিত না থাকায় আমাকে বলিলেন, রামকান্ত, এখানে ত পেয়াদা উপস্থিত নাই, অতএব তুমিই পেয়াদার পোষাক

পরিয়া অনুমতি পত্র লইয়া যাও। আমাকে এই পোসাক এবং অনুমতি পত্র প্রদান করিয়াছেন। আমি সেই পোসাক পরিয়া অনুমতিপত্র আনিয়াছি; এই লউন।” রামকান্ত এই সকল বলিয়া তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিলেন। বাণেশ্বর বলিলেন, “খোল্,—আগে তোর গায়ের পেয়াদাটা খোল্—তার পর পত্র দে।”

পরে পত্রে দেখিলেন, নবাব, রামকান্তকে বিষয়ের অর্দ্ধাংশ দিতে অনুমতি করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তল্পি হইতে, তুলট ও দোয়াৎ কলম বাহির করিয়া রামকান্তকে অর্দ্ধেক বিষয় লিখিয়াদিলেন। শুনা যায়, ঐ পত্র অথবা তাহার অনুলিপি অদ্যাপি তাঁহার বংশীয়দিগের গৃহে আছে।

রামকান্তের দুই একটী কথা বলিতে প্রতিশ্রুত আছি। রামকান্ত প্রায়ই বিদ্যালঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় অবস্থিতি করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহারও যথেষ্ট সমাদর করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার কথা শুনিতে রাজার বিলক্ষণ আমোদ ছিল। যখন তখন তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেন। এক দিন রামকান্ত বলিলেন, “মহারাজ, পেয়ে বড় তুষ্ট হইয়াছি, না পেলে আরও তুষ্ট হই।” প্রথমে কেহই কিছু বুঝিতে পারিলেন না। পরে জানিলেন, রামকান্ত জ্যেষ্ঠের সহিত গৃহ গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আবশ্যক

যাবতীয় দ্রব্য পাইয়াছেন, এখন এক খানি নৌকা পাই-বার প্রার্থনা করিতেছেন। অন্য এক দিন কহিলেন, "মহারাজ! বলিলে বলা যায়; না বলিলে মন ভাঙ্গা থাকে।" রাজভাণ্ডার হইতে বিদ্যালঙ্কার ও রামকান্ত প্রতিদিন এক মন তণ্ডুলের সিধা পাইতেন। এক জন চাকর ঐ সিধা হইতে চাউল চুরিকরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। রামকান্ত কিছুদিন এই ক্ষতি সহ্য করিয়া পরে, উপরি উক্ত বাক্যে রাজাকে তাহা জানাইয়াছিলেন। রামকান্ত প্রতি নিয়তই এইরূপ হেঁয়ালির ভাষায় কথা কহিয়া আমোদ করিতেন।

এদেশের মধ্যে নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময় নবদ্বীপে অনেক গুলি প্রধান প্রধান পণ্ডিত বর্ত্ত-মান ছিলেন। তাদৃশ সময়ে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সেই নবদ্বীপে, এবং কলিকাতা, উড়িষ্যা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে যথেষ্ট আদর ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" বাণেশ্বর ইহার প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন।

রামদুলাল সরকার *।

দমদমার অনতিদূরে রেকুজানি নামক এক খানি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। উহা এত ক্ষুদ্র যে, কলিকাতার অধিবাসিগণ উহার নামও জানিতেন না। ঐ গ্রামের সমস্ত অধিবাসীই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে বলরাম সরকার নামক এক জন গ্রাম্য গুরু মহাশয় ঐ গ্রামে বাস করিয়া কৃষক বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। পরিষ্কৃত হস্তাক্ষরই, তাঁহার একমাত্র বিদ্যা ছিল। এই শিক্ষাদানের উপার্জ্জন, কিঞ্চিৎ শস্য ব্যতীত আর কিছুই হইত না। তিনি কিছু নগদ অর্থ উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় বলদের পিঠে খড় বোঝাই দিয়া সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন কলিকাতায় গমন করিতেন। ঐ খড় অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইত। পূর্ব্বোক্ত শস্য এবং এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থ

* ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ মার্চ্চ বেলুড়নিবাসী বাবু গিরীশ চন্দ্র ঘোষ ইহাঁর জীবনচরিত অবলম্বন করিয়া হুগলি কালেজ গৃহে ইংরাজীভাষায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ স্থলে ঐ পুস্তকাবলম্বনে রামদুলালের জীবনচরিত লিখিত হইল। ইহাঁর প্রকৃত পদবী দে, কিন্তু ইনি রামদুলাল সরকার বলিয়াই অধিক বিখ্যাত।

দ্বারা অতি ক্লেশে কালযাপন করিতেন। সময় দোষে এতাদৃশ দুঃখের ভাতও, সুখে খাইতে পারিতেন না। যন্ত্রণাদায়ক দারিদ্র্য ক্লেশের সহিত যুদ্ধের মহাভয় সংযোজিত হইয়াছিল। সেই সময়ে এই দেশ, বর্গীর হঙ্গামে সতত উপদ্রুত হইতেছিল। ১১৪৮-৪৯সালের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। তাহাদের এই অত্যাচার, ক্রমাগত দশবৎসর চলিয়াছিল। ১১৫৮-৫৯ সালে যখন তাহারা বঙ্গদেশকে শেষ আক্রমণ করে, তখন বলরাম অবশিষ্ট গ্রামবাসিগণের সহিত প্রাণ রক্ষার্থ পলায়ন করেন। তাঁহার সম্পত্তি কিছুই ছিল না, কেবল এক গর্ভবতী স্ত্রী সঙ্গে ছিল। অত্যাচারিদলের অধিকার হইতে বহু দূরস্থিত এক প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া ঐ গর্ভবতী স্ত্রী আকবরের ন্যায় এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নামই রামদুলাল।

বলরাম, রামদুলালকে শুভঙ্করী বাঙ্গালা কি তাঁহার সুন্দর হস্তাক্ষর কিছুই শিখাইতে পারেন নাই; যেহেতু পুত্রজন্মের কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রামদুলালের পিতার মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। রামদুলালের পিতা মাতা যে, কেবল তাঁহাকেই নিরাশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা নহে, আর একটী পুত্র এবং আর একটী কন্যার প্রতিপালনের ভারও তাঁহার উপর দিয়া গিয়াছিলেন। এই

তিন অপোগণ্ড সাহায্যার্থী হইয়া কলিকাতানিবাসী মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের কুটীরে উপস্থিত হইল। রামসুন্দর বিশ্বাসের অবস্থা অতি হীন, এমন কি দৈনন্দিন মুষ্টি ভিক্ষা তাঁহার উপজীবিকা হইলেও তিনি সেই অপোগণ্ডদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা নিজ সন্ততিগণের ভরণপোষণ হওয়াই কঠিন হইত; এখন আবার কন্যার সন্ততিগণও তাঁহার পোষ্যবর্গ মধ্যে গণিত হওয়ায়, রামসুন্দর দ্বিগুণ উৎসাহ ও ক্লেশের সহিত ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম দুলালের মাতামহীও শ্রমকাতর ছিলেন না। তিনি ভাড়ানীর কর্ম্ম দ্বারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া স্বামীর সাহায্য করিতেন। তিনি, তাঁহার স্বোপার্জ্জিত তণ্ডুলের সমুদায়ই যে, আপনার ও আত্মপরিবারের ভরণ পোষণে ব্যয় করিতেন, তাহা নহে; প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় পথি পার্শ্বস্থ বহুসংখ্য ভিক্ষুগণকে ঐ তণ্ডুল বিতরণ করিতেন। যদিও তিনি নিজে যার পর নাই দুঃখিনী ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিলক্ষণ ধারণা ছিল যে, এই সৃষ্টিতে তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর দয়ার পাত্র সকল বর্ত্তমান আছে! যাহাদিগকে প্রাত্যহিক আহারের জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাদের এক দিনের ক্লেশ, উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকেরা সমস্ত জীবনেও কল্পনা করিতে পারে না।

তিনি এই উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক ছিলেন না, তিনি সামান্য ভিক্ষুপত্নীমাত্র ছিলেন। এই জন্যই দারিদ্র্যের স্থৈর্য্য নাশক ও ধর্ম্মভ্রংশক ক্লেশ তাঁহার উত্তমরূপে জানা ছিল ; এই জন্যই দেবতার ন্যায় দরিদ্রসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; এই জন্যই, ধান ভানার বিষম পরিশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই, আপনার ভাগ্য নিতান্ত নিকৃষ্ট হইলেও, দুর্গত ব্যক্তির ক্লেশনাশে তাদৃশ যত্নবতী হইয়াছিলেন। এতাদৃশ মাতামহী, আমাদের পরমজ্ঞানী শিক্ষক ও উপদেশ পূর্ণ পুস্তক অপেক্ষাও অধিক কার্য্যকারিণী। যাহা হউক, তিনি সদ্গুণের পুরস্কার পাইলেন ;—পরিশেষে তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল।

রামদুলালের মাতামহী, তাঁহাদের ভরণ পোষণের ভার লওয়ার কতিপয় বৎসর পরে, কলিকাতার অতি সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন মদনমোহন দত্তের অন্তঃপুরে পাচিকার কর্ম্ম গ্রহণ করেন। যদিও এই কর্ম্ম অতি নীচ এবং উহার আয় যৎসামান্য, তথাপি তাঁহার সেই পরিবারস্থ গৃহিণী-গণের ন্যায় সম্মান ছিল। সুতরাং রামদুলালকে সেই বাড়ীর পোষ্যবর্গের মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে তাঁহার কিছু মাত্র ক্লেশ হয় নাই। বঙ্গদেশে যে সকল গৃহস্থের অবস্থা তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে, ভৃত্যের সন্ততিগণের প্রতি-পালনও তাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন। এমন স্থলে,

যে মদনমোহন দত্ত বহুসংখ্য বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ধন বিষয়ে রাজা নবকৃষ্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না, রামদুলাল যে অতি সহজেই তাঁহার পোষ্য-গণের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রামদুলাল তাঁহার অন্নদাতার বাড়ীতে শিক্ষাসাধন করিতে লাগিলেন। শিক্ষাবিষয়ক অনুরাগ ও উৎসাহ, তাঁহাকে অবিলম্বে এক উৎকৃষ্ট লেখক ও উৎকৃষ্ট মোহ-রের করিয়া তুলিল। মদনদত্তের বালকগণের শিক্ষক, রামদুলালকেও শিক্ষা দিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এখন যেমন একমাত্র স্লেট, প্রথম শিক্ষার্থিগণের সকল অবস্থা-তেই ব্যবহৃত হয়, তখন তালপাত, বটপাত, কলাপাত প্রভৃতি দ্বারা ঐ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত; তখন স্লেট্ পেন্সিল ছিল না, তখন পেন্ ছোট লোকের কলম বলিয়া অনাদৃত হইত। রামদুলাল তালপাত সারিয়া কলাপাত ধরিলেন। তাঁহার মাতামহীর অবস্থা এমন ছিলনা যে, তিনি প্রতি দিন তাঁহাকে তাড়া তাড়া কলা-পাত কিনিয়া দেন। সুতরাং প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে লেখনীয় পাত পাইবার সুবিধা দেখিতে লাগিলেন। বালক কালেই তাঁহার মন, উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছিল। দত্তবাড়ীর বালকগণের লিখিত ও ইতস্ততঃ পরিত্যক্ত পাত ধৌত করিয়া লওয়া স্থির করিলেন। যে অধ্যবসায় পরি-ণামে সেই পিতৃহীন বালককে কলিকাতার প্রধান বণিক্

ও অপরিমিত অর্থের অধিকারী করিয়াছিল; তাঁহার বাল্যচরিতে সেই অধ্যবসায়ের মূল দৃষ্ট হয়। তিনি মধ্যাহ্ন রৌদ্রে অনাবৃতমস্তকে গঙ্গাস্রোতে আজানু মগ্ন হইয়া সেই সকল পত্র ধৌত করিয়া ব্যবহারযোগ্য করিতেন। সামান্য কলাপাতের জন্য তিনি এত ক্লেশ স্বীকার করেন, মদনমোহনদত্ত জানিতে পারিলে অবশ্যই দুঃখিত ও বিরক্ত হইতেন। কিন্তু রামদুলালের প্রতিভা যেস্থলে তাঁহার অভাবপূরণে সমর্থ হইত, সে স্থলে তিনি অপরের নিকট প্রার্থনা জানাইতে সম্মত হইতেন না। অধিকন্তু ইহাও তাঁহার মনে ছিল যে, মদনমোহন তাঁহার জন্য যথেষ্ট করেন, তাঁহাকে আর-অধিক ভারগ্রস্ত করা তাঁহার উচিত নহে। যাহা হউক, ক্রমে রামদুলাল উৎকৃষ্ট রূপে বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিলেন ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী মোহরের হইলেন এবং জাহাজের কাপ্তেন ও কর্ম্মচারিগণের সহিত কার্য্যোপযোগী ইংরাজী কথোপকথনে সমর্থ হইলেম। যখম পশ্চিম দেশীয় জ্ঞানতরঙ্গ ভারত উপকূলে আসিয়া পৌঁছে নাই, যখন সমুদায় দেশ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছিল, যখন সমস্ত ভারতবর্ষ যুদ্ধধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল; যখন বিদ্যালয় সকল উৎকৃষ্ট শাসনকার্য্যের উপাদান বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, যখন দেশীয় লোকের জ্ঞান, সামান্য বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষার দুই একটী অপশব্দকে অতিক্রম করিত না; তখন রামদু-

লালের শিক্ষা বিষয়ে উহাপেক্ষা অধিক আর কি আশা করা যাইতে পারে ?

রামদুলাল ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে নিরাশ্রয় নাবালক ভ্রাতার প্রতিপালন এবং জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মাতামহের ভিক্ষাক্লেশ নিবারণার্থ পূর্ব্বোক্তরূপ জ্ঞানাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া কষ্টকর ও নিষ্ঠুরতর জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মদনমোহন তাঁহাকে এবং নন্দকুমার বসু নামক তাঁহার আর একটী বন্ধুকে নিজ আফিসে কার্য্য শিক্ষার্থীরূপে গ্রহণ করিলেন। প্রতি দিন নিয়মিত কালে আফিসে যাইতে লাগিলেন। এক দিন তাঁহারা প্রখর রৌদ্র ও ঝটিকা প্রযুক্ত আফিসে যাইতে না পারিয়া আবাসে ফিরিয়া আসিলেন এবং ক্লেশে অবসন্ন হইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মদনমোহন আফিস হইতে প্রত্যাগত হইয়া বালকদ্বয়কে তাদৃশাবস্থ দেখিয়া মনে করিলেন, হয়ত তাহাদের কোন পীড়া হইয়াছে। রামদুলালকে গায় হাত দিয়া ডাকিতে লাগিলেন। রামদুলাল চকিত হইয়া একবারে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া তাঁহার একটু খ্যাতি হইয়াছিল, এবং সেই খ্যাতির উপর সমস্ত ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছিল। এখন সেই খ্যাতি বিলোপের সম্ভাবনা উপস্থিত। এমন স্থলে একটা মিথ্যা কথা দ্বারা সহজেই এই খ্যাতি

রক্ষিত হইতে পারে। বোধ হয়, এরূপ মিথ্যাকথার প্রলোভন অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য। কিন্তু মিথ্যার প্রতি রামদুলালের স্বাভাবিক বিদ্বেষ ছিল। তিনি, আবাসে ফিরিয়া আসিবার এবং নিদ্রিত হইবার প্রকৃত কারণ বলিলেন। ইহাতে মদনমোহন বিরক্তি সহকারে একটু হাসিয়া কহিলেন, "রামদুলাল, তুমি যদি রৌদ্র ও ধূলাকে ভয় কর, তবে তোমার কখনই কর্ম্ম পাইবার সম্ভাবনা নাই।" এই কথা শুনিয়া তিনি আপনার ক্ষমতা প্রদর্শনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

যাহাহউক রামদুলাল ক্রমে শ্রম ও কষ্টসাধ্য একটী সামান্য বিলসাধার কর্ম্ম পাইলেন। তিনি বর্ণনাতীত শ্রম ও দক্ষতা সহকারে ঐ কার্য্য করিতে লাগিলেন। মদনমোহনের সুবৃহৎ কার্য্য সম্বন্ধে কলিকাতা প্রদেশের সকল অংশেই তাঁহার দেনা পাওনা হইয়াছিল। ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, রৌদ্র নাই, ঐ পাওনা আদায়ের জন্য প্রতিদিনই রামদুলালকে পদব্রজে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে হইত। তিনি কলিকাতা হইতে বারাকপুর কিম্বা টিটেগড় প্রায় নিত্যই গমনাগমন করিতেন। রামদুলালের আনীত বিলের প্রতি, যদি এই সকল স্থানের কোন দেনদারের কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইত, রামদুলাল তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে গমন করিয়া আপনার নিয়োগ কর্ত্তার নিকট হইতে তাহার খোলাসা আনিয়া সেই

দিনই দেন্দারকে বুঝাইয়া দিতেন। এক দিন দমদমার কোন সৈনিক পুরুষের নামে অনেক টাকার এক খানি বিল ছিল। সৈনিক সাহেবেরা সচরাচর দরিদ্রের দুঃখ বুঝিতে পারেন না। তিনি রামদুলালকে টাকা দিতে বিলম্ব করিলেন। প্রথমাবস্থায় রামদুলালের বীরের ন্যায় সাহস ছিল; সেই এক রাশি টাকা লইয়া সন্ধ্যার পর কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে কলিকাতার উপনগর সকলে অত্যন্ত দস্যুভয় হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধে অপরাধী হইয়া যে সকল সৈন্য তাড়িত হইয়াছিল, তাহারাই এই স্থানে অত্যাচার করিত। দমদমা হইতে কলিকাতার পথ অদ্যাপি নিরাপদ নহে। রামদুলাল কিয়দ্দূর গিয়া আশ্রয় গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তিনি তৎকালীন সমাজের দূষিত অবস্থাও উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, যদি কাহারও বাড়ী যাই, আর সে আমার টাকার কথা জানিতে পারে, তাহা হইলে হঠাৎ বড় মানুষ হইবার আশয়ে সহজেই আমার প্রাণ নাশ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে। অতএব তিনি কাহারও বাড়ী গমন করিলেন না। অতিরিক্ত বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফকির বেশে টাকার থলি মাতায় দিয়া তরুতলে শয়ন করিলেন। নয়নে নিদ্রা নাই—পেচক ও শৃগালের ভীষণ চীৎকার শুনিতে শুনিতে রজনী প্রভাত

হইল। নিশার নৈরাপদনিবন্ধন জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

এই সকল কার্য্য দ্বারা রামদুলালের প্রতি মদনমোহন দত্তের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এখন রামদুলালের বেতন পাঁচ টাকামাত্র ছিল; কিন্তু তিনি বিলসরকারের এই সামান্য বেতন হইতেও অসাধারণ মিতব্যয়িতা দ্বারা এক শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এক শত টাকা কিছু দুঃখীর পক্ষে নিতান্ত অল্প নহে। তিনি আপনার সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি জন্য তাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করেন নাই, বাগবাজারের কোন কাঠের আড়তে ঐ টাকা জমা রাখিয়া এত কাজের মধ্যেও প্রতিদিন এক এক বার আড়তে যাইতেন এবং উহার লাভাংশ দ্বারা জরাজীর্ণ মাতামহ ও মাতামহীর প্রতিপালন করিতেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসরমাত্র, তখন যাঁহারা ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা তাঁহাকে এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে পোষণ করিয়াছিলেন, নিজে অর্দ্ধাশন করিয়াও, কেবল তাঁহাদিগের জন্যই কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন।

মদনমোহন দত্ত তাঁহার এই রূপ চরিত্র দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বুদ্ধি ও শ্রমশক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সিপ্‌সরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ইহা বিলসাধার কর্ম্মাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; ইহার

মাসিক বেতন দশ টাকা। কিন্তু এই কর্ম্মে যেমন মধ্যে মধ্যে পারিতোষিকের প্রত্যাশা ছিল; তেমনি মধ্যে মধ্যে জাহাজের নাবিক ও কাপ্তেন্‌দিগের নিকট হইতে প্রহারের সম্ভাবনাও বড় অল্প ছিল না। নিরন্তর এই রূপ কষ্টসহিষ্ণুতায় তাঁহার প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি কৃচ্ছ্র সহিষ্ণুতা, সাহস, সূক্ষ্মদর্শন এবং প্রস্তুতবুদ্ধি নিবন্ধন এক অদ্বিতীয় সিপ্‌সরকার হইয়াছিলেন। সিপ্‌সরকারদিগকে সর্ব্বদাই জাহাজের কর্ম্মচারিগণের সহিত ভয়ানকরূপে বিবাদ করিতে হইত। রামদুলাল যদিও ইংরাজী ভাষায় লিখিতে শিখেন নাই, কিন্তু পরিষ্কৃত রূপে কহিতে পারিতেন। এই জন্য তাঁহার জাহাজীয়দিগের সহিত বিবাদ করিতে, কোন অসুবিধা হইতনা। তাঁহাকে সকল ঋতুতেই নদীমুখে গমন করিয়া জাহাজের দ্রব্যাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। বস্তার সংখ্যা লইয়া বিবাদের আরম্ভ হইত। প্রায়ই ঘুঁসো ঘুঁসি না হইয়া এ সকল বিবাদের শেষ হইত না।

এই কার্য্যের একদিকে যেমন বিবিধ অসুবিধা, অন্য দিকে সেই রূপ লাভের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি এরূপ লাভের প্রত্যাশায় কখন অন্যায় পথে পদার্পণ করেন নাই। নদীমুখে গমনোপলক্ষে তিনি মধ্যে মধ্যে বিপদে পড়িতেন। এক দিন নৌকা ডুবিয়া জলে পড়েন, এবং সাত ক্রোশ পথ সন্তরণ পূর্ব্বক খিদিরপুর গিয়া

আত্মরক্ষা করেন। ঐ রূপে আর এক দিন তিনি এবং তাঁহার বন্ধু নন্দকুমার বসু বিপদাপন্ন হইয়া নদীতীরবর্ত্তী কোন ধীবরের গৃহে আশ্রয় লন। ধীবর তাঁহাদিগের শয্যার নিমিত্ত একটি ঝোঁতলা মাত্র প্রদান করে। ঐ শয্যায় শয়ন করিয়া সে রাত্রি তাঁহারা এতাদৃশ সুখানুভব করিয়াছিলেন যে, ঐশ্বর্য্যের সময় তাঁহারা উভয়েই আপন আপন শয্যাতলে সর্ব্বদা ঝোঁতলা ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক এই রূপে পুনঃ পুনঃ ডায়মণ্ড হারবারে গমন ও তত্রত্য জাহাজের ব্যাপার দর্শনে তিনি একটি অতি প্রয়োজনীয় গুণ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহার ভবিষ্যৎ পুরস্কারের পথ সুপরিষ্কৃত হইয়াছিল। যে সকল ভগ্ন ও মগ্ন জলযান টালার আফিসে নীলাম হইত, তিনি সহজেই তাহার মুল্যাদি নির্ণয় করিতে পারিতেন।

এক দিন রামদুলাল ভাগীরথীর মুখভাগে এক খানি জলমগ্ন জাহাজ দেখিয়াছিলেন এবং দর্শন মাত্রেই তৎসংক্রান্ত সমুদয় বিষয় অনুমান করেন। এমন কি! জাহাজ কিরূপে জল হইতে উদ্ধার করা যাইবে, তাহাতে কত দ্রব্য আছে, তাহার কত অংশ পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহার মুল্যই বা কি, ইহার কিছুই অনুমান করিতে অবশিষ্ট ছিলনা। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই মদন-মোহন দত্ত কিছু টাকা দিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট নীলাম ক্রয়

করিবার জন্য তাঁহাকে টালা কোম্পানির বাটিতে প্রেরণ করেন। রামদুলাল নীলাম আফিসে গমন করিবার কয়েক মিনিট্ পূর্ব্বে লক্ষিত নীলাম হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই শুনিতে পাইলেন যে, বোঝাই দ্রব্য সহিত এক খানি জলমগ্ন জাহাজ নীলামে ধরা হইয়াছে। এই নীলামে ধৃত জাহাজ খানি যে, তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট জাহাজ ইহা অতি সহজেই স্থির করিলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নীলাম স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার অনুমিত মূল্য অপেক্ষা অতি অল্প ডাক হইতেছে দেখিয়া সেই নীলাম ক্রয়ে নিতান্ত প্রলোভিত হইলেন। তাঁহার ডাক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায় তাঁহার প্রভু মদনমোহন দত্তের নামে ১৪০০০ হাজার টাকা মূল্যে নীলাম ক্রয় করা হইল। তিনি সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া কোন গৃহে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক জন ইয়ুরোপীয় ঐ নীলাম ক্রয় করিবার আশয়ে অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে টালার আফিসে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, তাঁহার অভিলষিত বিষয় একজন বাঙ্গালী সরকারের হস্তগত হইয়াছে, তিনি দুঃখিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দর্শনে অনুমিত হইয়াছিল যে, ঐ জাহাজের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ আছে এবং তাহার বোঝাই দ্রব্যের বিষয় তিনি সবিশেষ অবগত

আছেন। ক্ষণকাল অনুসন্ধানের পর রামদুলালের সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাকে প্রচুর গালিবর্ষণ পূর্ব্বক বিবিধ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। রামদুলাল তাহাতে ভীত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি আপনার স্বত্ব উত্তমরূপ বুঝিতেন। সাহেব, যখন বন্যজন্তুর ন্যায় ক্রোধপ্রকাশ করিতে ছিলেন, রাম-দুলাল তখন হাসিতে ছিলেন। সাহেব যখন দেখি-লেন, ক্রোধ ও ভয়প্রদর্শনে রামদুলালের মন বিচ-লিত হইল না, তখন তিনি আপনার স্বর পরিবর্ত্তন করিলেন। জাহাজ খানি লইবার জন্য রামদুলালকে লাভ দিতে চাহিলেন। রামদুলালের, ইহাতে আপত্তি করিবার কারণ ছিল না। তিনি ইচ্ছানুরূপ লাভ পাইলে নীলাম ফিরাইয়া দিবেন স্বীকার করিলেন। সাহেব অনেক কসা কসির পর ১৪,০০০ হাজার টাকার উপর প্রায় লক্ষ টাকা লাভ দিয়া জাহাজ লইলেন।

যে টাকা দ্বারা এতাদৃশ লাভ হইল, রামদুলালের প্রভু সে টাকার অধিকারী। যদিও মদনমোহন দত্ত স্বপ্নেও দেখেন নাই যে, তিনি যে টাকা, কোন দ্রব্য ক্রয়ার্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সরকার সেই টাকা দ্বারা তাঁহার নামে এক জাহাজ ক্রয় করিয়াছে, যদিও রামদুলাল অনায়াসেই লাভাংশ গোপন করিয়া প্রভুর সমস্ত টাকা ফিরাইয়া দিতে পারিতেন; যদিও

রামদুলালকে মাসিক দশ টাকা বেতনের জন্য প্রতিদিন বিবিধ বিপদের মুখে পড়িতে হইত; যে প্রলোভনে সামান্য লোককে নিশ্চয়ই বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে, হঠাৎ বড় মানুষ হইবার সেই প্রলোভন, ইহাতেও প্রচুর পরিমাণে ছিল; তথাপি এ লাভ মদনমোহন দত্ত ভিন্ন অন্য ব্যক্তির হওয়া উচিত কি না! ক্ষণকালের জন্যও এ চিন্তা রামদুলালকে আন্দোলিত করিতে পারে নাই। কারণ তাঁহার ধর্ম্মনীতি অত্যন্ত বলবতী ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ সকল প্রকার প্রবঞ্চনাকেই ঘৃণা করিত। তাঁহার ধর্ম্মনীতির পবিত্রতা, বয়সের পরিপাকাবস্থায় এতাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তদ্দর্শনে উচ্চশ্রেণীস্থ সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও লজ্জিত হইতেন।

যাহা হউক, তিনি প্রাগুক্ত লাভ আত্মসাৎ করিবেন, এক বার মনেও করেন নাই; এবং প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে এই কার্য্য করায় তাঁহার দোষী হইবার সম্ভাবনা আছে, এই রূপ ভাবিয়া অপরাধীর ন্যায় প্রভুসমীপে গমন করিলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে সমুদয় যথাযথ নিবেদন করিয়া স্বকীয় অবাধ্যতা প্রযুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং এক তাড়া ব্যাঙ্ক নোট্ তাঁহার চরণে নিক্ষেপ করিলেন। মদনমোহন দত্ত কিয়ৎক্ষণ বিস্মিতভাবে রামদুলালের সরলতা দর্শন ও তাঁহার অসামান্য মহত্ত্ব চিন্তা করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহি-

লেন ;—"রামদুলাল, এ অর্থ তোমার, তোমার সৌভাগ্যই ইহা প্রেরণ করিয়াছে। তুমি বীজ বপন করিয়াছ, তুমিই তাহার ফল ভোগ কর।" রামদুলাল অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত এ পুরস্কার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কিয়ৎ কাল তাঁহার মুখ হইতে কোন বাক্য নিঃসারিত হয় নাই। দশ টাকা মাহিয়ানার এক জন সরকারের পক্ষে ইহা কিছু কম ব্যাপার নহে। কিন্তু এতাদৃশ ভাগ্য পরিবর্ত্তনে তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হয় নাই। তিনি এই মূল ধন অবলম্বন করিয়া কলিকাতার মধ্যে অদ্বিতীয় ধনী হইয়াছিলেন ; তথাপি মদনমোহন দত্ত যত দিন জীবিত ছিলেন, সামান্য চাকরের মধ্যগত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে সেই দশ টাকা বেতন লইয়া আসিতেন এবং এক দিনের জন্যও পুর্ব্ববৎ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে ক্রুটি করেন নাই। এমন কি ! তিনি অত্যন্ত উন্নতির সময়েও পাদুকা ত্যাগ ও হস্তদ্বয় বক্ষবদ্ধ করিয়া মদন দত্তের গৃহে প্রবেশ করিতেন। ঐশ্বর্য্য লাভ বিষয়ে তাঁহার মনের ভাব এই রূপ ছিল যে, সৌভাগ্যের সময়ে দুর্ভাগ্যের দিন সকল মনে করা সকলেরই উচিত।

এই লক্ষ টাকাই রামদুলালের সকল সৌভাগ্যের মুল। তিনি এই টাকাটী, কেবল একটী বিশ্বাসের কার্য্য দ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যে বিশ্বাস অধুনা-

তন বণিক্ সমাজে উপন্যাস হইয়াছে। বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবসায় দ্বারা তিনি ঐ টাকা এত বাড়াইয়াছিলেন যে, প্রতিদিন রাজার ন্যায় ব্যয় করিয়াও মৃত্যু কালে এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিপুল বিভব, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের অনভিজ্ঞতা, এবং বিলাসলালসায়, এক্ষণে নিঃশেষিত হইয়াছে। তাঁহার ভদ্রতা প্রযুক্ত, ক্রমে তিনি বণিক্ সম্প্রদায়ের প্রধান হইয়া উঠিলেন। তিনি, উৎকৃষ্ট চরিত্র, মনুষ্যোচিত বিনয় এবং সূক্ষ্মতর দূর দর্শন প্রভাবে অচিরকাল মধ্যে সকলের সম্মান ও অনুরাগের পাত্র হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে তিনি যাহাদিগের সম্মুখে সামান্য কর্ম্মচারী ভাবে গমন করিতেন, এক্ষণে তাহাদিগের সমকক্ষ হইয়া বাণিজ্যাদি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ১১৯০ সালে আমেরিকার প্রজাগণ ইংলণ্ডের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে সাধারণতন্ত্র রাজ্যপ্রণালী স্থাপিত করে। এই উপলক্ষে যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আমেরিকান্ নাবিকগণ ধন ও খ্যাতি লাভের প্রত্যাশায় সমুদ্র যাত্রা করে। রামদুলালই বঙ্গদেশে মার্কিন বাণিজ্যের পথ প্রদর্শক ছিলেন। এই সময়ে তিনি বাঙ্গালার বন্দর সকলে আমেরিকার মিলিত রাজ্যের বাণিজ্য বিস্তার করিবার জন্য অতিশয় কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিতে

লাগিলেন। তিনি আমেরিকার কাপ্‌তেনদিগকে রাশি রাশি অর্থ অগ্রিম দিতে লাগিলেন। সুবিবেচনা পূর্ব্বক বাণিজ্য দ্রব্য নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগের জাহাজ পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন এবং অধিকতর লাভে তাহাদের আমদানী সকল বিক্রয় করিয়া দিতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্যে এত লাভ হইতে লাগিল যে তিনি, শীঘ্রই বড় মানুষ হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে আমেরিকাস্থ সমস্ত বাণিজ্যাগারের এক মাত্র প্রতিনিধি হইয়া ছিলেন। তিনি কলিকাতানগরীতে নিজের যে বিস্তৃত বাণিজ্যাগার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি তাঁহার দৌহিত্রগণের তত্ত্বাবধানে কোনরূপে বর্ত্তমান আছে। বাণিজ্য বিষয়ে আমেরিকার সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ হইয়াছিল; পাঠকগণের বিরক্তিকর হইবার শঙ্কায় এস্থলে তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইল না; কেবল তৎসংক্রান্ত দুই একটী গল্প করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যাইবে।

আমেরিকায় তাঁহার এতাদৃশ সম্মান হইয়াছিল যে, এক জন পোতাধিকারী তাঁহার নামে নিজ জাহাজের নামকরণ করিয়াছিলেন এবং সেই জাহাজ খানি রাম-দুলালের জীবিত কালের মধ্যে তিন বার তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়া ছিল।

কোন সময়ে আমেরিকার কতকগুলি প্রধান বণিক্

তত্রত্য প্রধান সেনাপতি ওয়াসিংটনের শরীর পরিমিত এক চিত্র, সম্মান ও স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ রামদুলালকে উপহার দিয়াছিলেন। কোন বাঙ্গালী কস্মিন্ কালে কোন মহাদেশের বনিক্‌সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এরূপে সমাদৃত হন নাই।

রামদুলাল বিবিধ গুণগ্রামে সকল শ্রেণীস্থ লোকের অনুরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্যই আমেরিকার অধিবাসিগণ, হিন্দু জাতির প্রতি প্রথম সম্মান করিতে শিক্ষা করেন। তিনি যে কেবল আমেরিকাতেই এত সম্মান লাভ করিয়া ছিলেন, তাহা নহে; ইংলণ্ড, ফিলিপাইন, চীন্ প্রভৃতি বহুতর প্রদেশীয় বনিক সম্প্রদায়ের মাননীয় প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার নিজের কাজও বিলক্ষণ বিস্তৃত ছিল। কি আশ্চর্য্য! এত কার্য্যের মধ্যেও তিনি তৎকালীন সর্ব্ব প্রধান ইয়ুরোপীয় বাণিজ্যাগারের মুচ্ছুদ্দি হইয়াছিলেন। ঐ কারুলি করগুসন কোম্পানির হাউসের কার্য্য বিবরণ শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ কোম্পানি এক এক বারে লক্ষ বস্তা চাউল জাহাজ বোঝাই করিতেন। চিনি রপ্তানি করিলে এদেশীয় চিনির বাজার নিঃশেষিত হইয়া যাইত। ঐ হাউসের দালালেরা বাজারে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে গেলে, তৎকালীন আর কোন হাউসের তাহা ক্রয় করিতে সাহস হইত না। এখন

কলিকাতায় যে সকল ইয়ুরোপীয় বাণিজ্যাগার বর্ত্তমান আছে, তাহার পঞ্চাশটীর কার্য্য একত্রিত করিলে যত হয়; তাদৃশ কার্য্যবিশিষ্ট তিন চারিটী হাউস্ তৎকালে কলিকাতায় ছিল; কিন্তু রামদুলাল যে হাউসের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, তাহা সে সমুদায়ের মধ্যে প্রধান ছিল। প্রয়োজন হইলে রামদুলাল যে সে বাজারে ঋণ করিতে পারিতেন; তাঁহার কথাকেই লোকে ষ্ট্যাম্পলিখিত খতের স্বরূপ মনে করিত। তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র অমনোযোগে বাজার বিশৃঙ্খল হইত। তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিত না, তৎকালে এমন বণিক্ প্রায় ছিল না।

তৎকালের অন্যতম হাউসের এক জন ক্লার্ক আশুতোষ দেবকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা আছে যে, তিনি হাউসের অংশিগণকে, রামদুলালের আগমনে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে এবং তাঁহার সহিত সকল বিষয়ের পরামর্শ করিতে দেখিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, রামদুলালের ন্যায় মুচ্ছুদ্দি, কাজের লোক, দয়ালু ও বদান্য তৎকালে কেহই ছিল না। কোন ব্যক্তি আপনার নিমিত্ত তাঁহাকে যাহা করিতে বলিত, তিনি তাহার নিমিত্ত তাহাই করিতে প্রস্তুত হইতেন।

রামদুলাল জাতিবিশেষের প্রতি বদান্য ছিলেন না; তাঁহার অন্তঃকরণ এত প্রশস্ত ছিল যে, সমস্ত

বিশ্বের উপকার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইত না। ইহার প্রমাণ বিষয়ে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এক ইউরোপীয়দিগকেই তিনি ৩৩০০০০০ তেত্রিশ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। উহা আদায়ের জন্য কখন কোন পীড়াপীড়ি করা হয় নাই। উহার অধিকাংশ অদ্যাপি অনাদায় রহিয়াছে। তিনি মনে করিতেন পৃথিবীই তাঁহার গৃহ এবং সৃষ্টিই তাঁহার জাতি।

যে অপোগণ্ড বালককে তাহার মাতামহ দৈনিক মুষ্টি ভিক্ষার দ্বারা প্রতিপালন করিতেন, এক্ষণে সেই বালক বঙ্গ রাজ্যের এক জন প্রধান হইলেন। তাঁহার নিজের চারি খানি বাণিজ্য জাহাজ ছিল। তন্মধ্যে এক খানি আপনার নামে, এক খানি প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা বিমলার নামে, এক খানি ফ্রারলি ফরগুসন্ কোম্পানির এক জন প্রধান অংশী ডেবিড্ ক্লার্কের নামে অভিহিত হইত। চতুর্থ জাহাজ খানির কোন বিশেষ নাম ছিল না, কিন্তু সেখানি, আমেরিকা, ইংলণ্ড, চীন এবং মাল্টা এই সকল স্থানে দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত। বাজারে তাঁহার সম্মানের সীমা ছিল না। সম সাময়িক প্রধান প্রধান বণিকেরা তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য, যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। কোন সময়ে কলিকাতার কয়েকটী বড় বড় হাউস্ দেউলিয়া হইয়াছিল। ঐ সময়ে রাম দুলালেরও ২৫০০০০০ পঁচিশ

লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। কিন্তু ঐ ক্ষতিতে তাঁহার ব্যব-সায়ের কোন হানি হয় নাই। এই বিষয় উপলক্ষে ইংলণ্ডের কোন সম্পাদক রাম দুলালের পুত্রদিগকে বাঙ্গালার রথ চাইল্ড্ (১) বলিয়াছিলেন। রাম দুলাল যাহা স্পর্শ করিতেন, তাহাই স্বর্ণ হইত। বোধ হয়, রাম দুলালের নিকট যথার্থই স্পর্শমণি ছিল।

কোন সময়ে তিনি কতক গুলি কাচের বাসন ক্রয় করিয়াছিলেন। উহা ক্রয় করিয়া যে, লাভ হইবে, কলিকাতার কোন বণিক তাহা একবার মনেও করেন নাই। হঠাৎ মান্দ্রাজে ঐ দ্রব্যের অত্যন্ত প্রয়োজন হওয়াতে, রাম দুলাল ইচ্ছানুরূপ লাভ লইয়া উহা বিক্রয় করিলেন।

আর এক সময় অনেক টাকার গোল মরিচ ক্রয় করিয়াছিলেন। তখন ঐ জিনিসের বাজার অত্যন্ত নরম ছিল। কিছু দিন পরে কোন বিদেশে উহার অধিক দর উঠিল। রাম দুলাল চারি গুণ লাভে সমস্ত মরিচ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এই বাণিজ্য ব্যাপা-রের সহিত সংসৃষ্ট একটী গল্প প্রসিদ্ধ আছে, যদ্দারা, রাম দুলাল কি ধাতুর মানুষ ছিলেন এবং সত্যের প্রতি

---

(১) রথ চাইল্ড নামক একজন ইহুদি জাতীয় বণিক লণ্ডন নগরে কারবার করিতেন। তাঁহার সময়ে তত্তুল্য ধনবান প্রায় আর কেহ ছিল না।

তাঁহার কীদৃশ গাঢ়ানুরাগ ছিল, তাহা উত্তম রূপে জানা যাইবে।

যখন রামদুলাল আপনার ক্রীত রাশীকৃত মরিচ বিক্রয়ার্থ রক্ষা করিতেছিলেন, এবং যাহা বিক্রয় হইবে কি না সে বিষয়ে লোকে সংশয় করিতেছিল; সেই সময়ে এক জন ইউরোপীয় তাঁহার নিকট বহু সহস্র মণ মরিচ বন্ধক রাখিয়া টাকা ঋণ লইবার প্রস্তাব করেন। রাম দুলাল বলিলেন, উপযুক্ত মুল্যে সাহেবের সমস্ত মরিচ তিনি ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন, বন্ধক রাখিয়া টাকা দিবেন না। কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, সাহেবের মরিচ গুলি কোষসাৎ করিতে পারিলেই মরিচের বাজার তাঁহার একচেটে করা হইবে। তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন ও চতুর বণিকের মুখে ঐ কথা শুনিয়া মরিচ ছাড়িতে সাহেবের সাহস হইল না। তিনি অনেক ক্ষণ ভাবিয়া শেষে, বিবেচনা করিবার সময় লইয়া প্রস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতায় মরিচের বাজার উঠিল। রামদুলাল, চারি গুণ লাভে নিজের ও উক্ত সাহেবের সমস্ত মরিচ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কিছু দিন পরে, সেই সাহেব রামদুলালের নিকট আসিয়া পূর্ব্ব বাজার দরে তাঁহার সমস্ত মরিচ বিক্রয় করিলেন। এই বিক্রয়, এমন যথা বিহিত রূপে হইয়াছিল যে, রামদুলাল তাঁহার মরিচ হইতে যথেষ্ট লাভ

করিয়াছেন সাহেব পরে ইহা জানিতে পারিলেও, কিছু করিতে পারিতেন না। যাহা হউক, সাহেব যখন দেখিলেন যে, তাঁহার হিসাবে যত টাকা প্রাপ্য, রামদুলাল, তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক টাকা দিতেছেন ; তখন তিনি বিস্মিত হইয়া, রামদুলালের ভ্রম হইতেছে কি না এই বিষয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রামদুলাল অবিলম্বে তাঁহার ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিলেন। তখন সাহেব বহু লক্ষ টাকা লাভ করিয়া রামদুলালকে শতশত ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন। রামদুলালের এই সাধুতা সমস্ত স্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পরিশেষে সমুদ্রে তরঙ্গায়িত হইয়াছিল।

যে জলমগ্ন জাহাজ ক্রয় হইতে রামদুলালের ঐশ্বর্য্য হইতে থাকে, সেই জাহাজ ক্রয়ের কয়েক মাস পূর্ব্বে মূলাযোড়ের কোন সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্না রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বঙ্গদেশে "স্ত্রীভাগ্যে ঐশ্বর্য্য ও স্বামী ভাগ্যে পুত্র লাভ হয়" এইরূপ একটি প্রবাদ আছে। বিবাহের পর হইতেই রামদুলালের অনবরত ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে দেখিয়া ঐ প্রবাদের সত্যতায় লোকের বিশ্বাস হইল। রামদুলাল যেমন অপরিমিত অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, গৃহিণী সেই রূপ অপরিমিত ভাবেই ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

কোন সময়ে রামদুলাল অনেক বস্তা উৎকৃষ্ট বনাত

ক্রয় করিয়াছিলেন। ঐ বনাতের দুই পৃষ্ঠা, ভিন্ন ভিন্ন রং বিশিষ্ট। বিলাতের সঙ্গে বঙ্গদেশের বাণিজ্য আরম্ভ হইয়া অবধি এদেশে আর কখন এরূপ বনাতের আমদানি হয় নাই। রামদুলাল ঐ বনাতের একচেটে করিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, যখন ইচ্ছা তখন আপনার অভিপ্রেত দরে উহা বিক্রয় করিবেন। এই রূপ স্থির করিয়া আপনার গৃহ স্থিত নিরাপদ ভাণ্ডারে উহা রাখিয়া দিলেন। ঐ বনাতের গজ ৩০ ত্রিশ টাকা। যখন এদেশীয় লোকদিগের টাকা কড়ি তত অধিক ছিল না, তখন একখানা বনাতের দাম ৯০ নব্বই টাকা, ইহা কিছু কম কথা নহে। কিছু দিন পরে একদা শীত-কালের প্রত্যূষে রামদুলাল বারেণ্ডায় মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন, দেখিলেন, কয়েক জন ব্রাহ্মণ প্রাতঃ-স্নান করিয়া উক্ত বনাতে গাত্র আবরণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী পথে গমন করিতেছেন। রামদুলালের স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তিনি উহার একচেটে করিয়াছেন। এখন হঠাৎ অন্য লোকের গাত্রে ঐ বনাত দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। সে দিন আফিসে গিয়াই দালাল-দিগকে ডাকিলেন। কার্য্যে অমনোযোগ নিবন্ধন তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন এবং এই বলিয়া বাজারে পাঠাইয়া দিলেন, এ বনাতের যতটুকু যেখানে যে মূল্যে পাইবে, সমুদায় ক্রয় করিয়া আনিবে। কিন্তু

দালালগণ সমস্ত দিন বৃথা ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে প্রত্যাগত হইল। কহিল, বাজারে কুত্রাপি অঙ্গুলি পরিমিত এ বনাত পাওয়া যায় না; এবং বিগত তিন মাস হইতে পাওয়া যাইতেছে না। রামদুলাল, আপন চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। সুতরাং বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যদি ইহা বাজার হইতে না আসিল, তবে কি আকাশ হইতে পড়িল?"

রামদুলাল অনেক ক্ষণ গাঢ়রূপে এই বিষয় চিন্তা করিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং কোষ পর্য্যবেক্ষণার্থ গমন করিবামাত্র সব জানিতে পারিলেন। রামদুলাল যখন বনাত বিক্রয়ের লাভ গণনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দয়াশীলা গৃহিণী শীতার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের ক্লেশ ভাবিতেছিলেন। মাঘ মাসের প্রাতঃকালে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণেরা কত ক্লেশ পান এবং তৎকালে এই বনাত গায় দিতে পাইলে কত সুখানুভব করেন, রামদুলালের গৃহিণী তখন তাহাই ভাবিতেছিলেন। এইরূপ ভাবিয়া, সেই ধর্ম্মবীরা রমণী একদা স্বামীর, এমন কি দাস দাসীগণেরও অজ্ঞাতে কোষ হইতে কয়েকটা বস্তা বাহির করিলেন এবং স্বহস্তে এক এক খণ্ড চাদর কাটিয়া প্রতিবেশবাসী এক শত ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। রামদুলাল সেই সকল ব্রাহ্মণকে বনাত গায় দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি এই

বিষয় অবগত হইয়া স্ত্রীকে একটী কথাও বলিলেন না। রামদুলাল যেমন মহানুভব, স্ত্রীও সর্ব্বাংশে তাঁহার অনুরূপ ছিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতে এই স্ত্রী কর্ত্তৃক যে মহৎ কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছিল, তিনি পর দিন প্রাতে তাহা সম্পূর্ণ করিলেন; সেই মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট বনাতের অবশিষ্ট, প্রতিবেশী ও বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।

আর এক সময়ে রামদুলাল অনেক টাকা দিয়া ৬০০ শত বস্তা উৎকৃষ্ট চিনি ক্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত কোষে রাখিয়া ছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার স্ত্রী তিন মাস ক্রমাগত পুরাণ পাঠ করান। এই উপলক্ষে তাঁহার গৃহে প্রতিদিন সহস্র সহস্র স্ত্রী লোক উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তিনি এই বহুসংখ্য শ্রোত্রীকে তিনমাস যাবৎ উক্ত চিনির সরবৎ পান করাইলেন। প্রায় সমুদায় চিনিই এই ব্যাপারে জলসাৎ হইল। কেবল ৪০ বস্তা মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

এ দিকে সুবিধা পাইয়া রামদুলাল সমস্ত চিনি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন এবং ক্রেতাকে ঐ চিনি ওজন দিবার নিমিত্ত বাড়ীতে দালাল পাঠাইলেন। প্রেরিত ব্যক্তি, অবিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে জানাইল যে, ভাণ্ডারে ৪০ বস্তার অধিক চিনি নাই, অবশিষ্ট ৫৬০ বস্তা গৃহস্বামিনী নষ্ট করিয়াছেন।

রামদুলাল বিস্মিত হইলেন। যদিও গৃহিণী কি প্রকৃতির লোক, বনাতের ব্যাপারে জানা ছিল, তথাপি এবার তাঁহার বিরক্ত হইবার প্রচুর কারণ উপস্থিত হয়। যেহেতু ঐ চিনি অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন, এবং ঐ স্বীকৃতি পালনে অসমর্থ হইয়া ক্রেতার ক্ষতিপূরণ করিতে বাধিত হইয়াছিলেন। এই জন্য আফিসের পর সন্ধ্যাকালে গৃহে গমন করিয়া বরাবর স্ত্রীর নিকটে গেলেন এবং তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বলিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ক্রোধের আতিশয্যে তিরস্কার করিতে করিতে তাঁহাকে সৌভাগ্যের শনি বলিয়াছিলেন। গৃহিণী স্বামীকৃত পূর্ব্ব তিরস্কার সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু "সৌভাগ্যের শনি" এই তিরস্কার বাক্য সহ্য হইল না। কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার ভাগ্যই, রামদুলালকে সিপ্‌সরকারের ঘৃণিত পদ হইতে তাদৃশ গৌরবান্বিত পদে উন্নত করিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত তিরস্কার বাক্যটী তাঁহার অন্তরে ছুরিকাবিদ্ধ হইল। অবিলম্বে তাঁহার লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল;—"আমি তোমার সৌভাগ্যের শনি ?" অনুচ্চৈঃস্বরে পুনরাবৃত্তি করিয়া ক্রোধোন্মত্তার ন্যায় শয়ন গৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

রামদুলাল পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় যাদৃশ ক্রোধান্ধ হইয়া-

ছিলেন, তাঁহার ৭৩ বৎসর পরিমিত দীর্ঘ জীবনের মধ্যে কখনই সেরূপ হয়েন নাই। যে বয়সে সামান্য লোকেরা স্বভাবতঃ ক্রোধন ও দুরন্ত হয়, রামদুলাল সে সময়ে সম্পূর্ণ বিনয়ী, কোমল ও সাধু স্বভাব ছিলেন। সর্ব্বপ্রকার গালির মধ্যে তিনি কেবল "মহাপাত্র" এই তিরস্কার বচনটী জানিতেন। কাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইলে তাহাকে "মহাপাত্র" বলিয়া গালি দিতেন। দুর্ব্বাক্য দ্বারা স্ত্রীর মনে ব্যথা দিয়া পরিশেষে স্বয়ং ক্ষুব্ধ ও অনুতাপিত হইলেন। সুতরাং অনেক যত্নে এবং নগদ একলক্ষ টাকা দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

ঐ রমণীর চরিত্র পাঠে বোধ হয়, তিনি যেন কোন উৎকৃষ্ট কাব্যের কল্পিত নায়িকা। তাদৃশী নারী বাস্তবিক জীবিতা ছিলেন কিনা, সন্দেহ উপস্থিত হয়। একদা কোন ব্যক্তি তাঁহার রত্নাভরণ চুরি করিয়া ধৃত হয়। চোর নিতান্ত জ্বালায় না পড়িয়া চুরি করে নাই, তিনি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া সমস্ত স্তেয়ের সহিত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। রামদুলালের স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যান অনেক আছে; কিন্তু সংক্ষিপ্ততা এই গ্রন্থের একটী উদ্দেশ্য বলিয়া সে সকল পরিত্যক্ত হইল। কেবল যে সকলের সহিত রামদুলালের সংস্রব আছে, সেই

রূপ দুই একটী আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে; এবং পরে আবশ্যক হইলে আরও দুই একটী লিখিত হইবে।

রামদুলাল দারান্তর গ্রহণে বাধিত হইয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটী কন্যা এবং একটী অন্ধ পুত্র মাত্র জন্মিয়া ছিল। ঐ অন্ধ পুত্রটীও সাত বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময়েই তাঁহার ঐশ্বর্য্য আরও অধিক বৃদ্ধি পায়। তাঁহার প্রথমা ও প্রিয়তমা পত্নীর গর্ভেই পুনর্ব্বার পুত্র সন্তান জন্মিবে তাঁহার এরূপ আশা ও বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সে আশা বিফল হইল। তাঁহার মরণান্তে এই বিপুল বিভব পরের হস্তগত হইবে এবং পুত্রাভাবে পুন্নাম নরকে পতিত হইবেন, এই চিন্তা ও ভয়ে তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। অনন্তর শাস্ত্রবিদ্ ও বন্ধুবর্গের পরামর্শে প্রথমা স্ত্রীর অজ্ঞাতে দ্বিতীয় দারগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র গৃহে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে যে সকল সন্তান হইয়াছিল, সকলই ঐ পৃথক বাটিতে জন্ম গ্রহণ করে। প্রথমা, ক্রমে এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া কখন স্ত্রীত্ব, কখন মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

রামদুলালের চাল চলন অতি সামান্য ছিল। তাঁহার প্রাত্যহিক আহার দিনমানে অন্ন, তরকারী,

অল্প পরিমিত দুগ্ধ ও মিষ্ট। রাত্রে ভাতের বদলে কয়েকখান রুটী মাত্র। কলিকাতার প্রধান বণিকেরা আসন ত্যাগ করিয়া যাঁহার সম্মান করিতেন, সেই রামদুলালের পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। সামান্য ধুতি, ফ্লানেলের ব্যানিয়ান, লংক্লথের ছোট চাপ্‌কান এবং মাতায় জড়াইবার কয়েক গজ কাপড়, এইমাত্র তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। বর্ত্তমান কালের বড়মানুষেরা যে অবস্থায় ছয় বা আট ঘোড়ার গাড়ী রাখেন, তিনি সে অবস্থায় পালকী ব্যবহার করিতেন। কোন ব্যক্তি একদা তাঁহাকে গাড়ী রাখিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন যে, নিকৃষ্ট পশু অপেক্ষা মনুষ্য পোষণের উপায় বিধান করা অগ্রে কর্ত্তব্য। পরিশেষে পরিজনগণের অনুরোধে যখন গাড়ী রাখা হয়, তখন পথিকের পীড়া শঙ্কায়, চালককে কখনই কোচ্‌বাক্সে বসিয়া গাড়ী চালাইতে দিতেন না। কোচ্‌ম্যান্ অশ্বের বলগা ধারণ পূর্ব্বক নগর পথে শকট চালন করিত। তিনি নিকৃষ্ট জীবগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেও উদাসীন ছিলেন না।

রামদুলালের বদান্যতাও অসামান্য। অধিকতর সুখ্যাতির বিষয় এই, রাশি রাশি দান করিতেন, তাহার কোন আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার সময়ে মান্দ্রাজে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ঐ দুর্ভিক্ষে

সাহায্য দিবার জন্য কলিকাতা মহানগরীতে চাঁদা সংগ্রহের এক সভা হয়। রামদুলাল ঐ সভায় লক্ষ টাকা দান করেন। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠাকালে তিনি ৩০০০ তিন হাজার টাকা দান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতিদিন আফিসে বসিয়া ৭০ টাকা দান করিতেন। প্রায় চারিশত দরিদ্র প্রতিবেশীকে প্রতিদিন আহার দিতেন। তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই অনেক কর্ম্মার্থী উপস্থিত থাকিত। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ঐ উমেদারগণের অভাব অনুসন্ধান করিতেন। কোন কোন ব্যক্তিকে পরিবার পালনে সমর্থ করিবার জন্য তাহাদের বাসায় ব্যাঙ্কনোট্ প্রেরণ করিতেন; কিন্তু নোট কোথা হইতে আসিল, তাহারা তাহার কিছুই জানিতে পারিত না। কখন বা কাহার হাতে, তাহার বাটী হইতে আসিয়াছে বলিয়া, একখানি পত্র দিতেন। সে পত্র খুলিতে উদ্যত হইলে, শান্তভাবে কহিতেন;—"এই পত্র মধ্যে মন্দ সম্বাদ থাকিতে পারে, বিদেশীয়গণের সম্মুখে শোকমোহ জনক সম্বাদ পাঠ করা উচিত নহে। বাসায় গিয়া পত্র পাঠ করিও।" বাসায় গিয়া ঐ ব্যক্তি পত্র খুলিবামাত্র দেখিতে পাইত তন্মধ্যে ৪০, ৬০ কিম্বা ১০০ এক শত টাকার ব্যাঙ্ক নোট রহিয়াছে। তাহার বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। কোন ব্যক্তিকেই রামদুলালের নিকট প্রার্থনা করিয়া

বিফল হইতে হইত না। পরদুঃখ মোচনের ইচ্ছা তাঁহার এত বলবতী ছিল যে, তিনি পরের দুঃখ অনুসন্ধান জন্য বেতন-ভুক্ চাকর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিন জন দেশীয় চিকিৎসক, রামদুলালের ব্যয়ে পল্লীর পীড়িত গণের চিকিৎসা ও ঔষধ দানে নিযুক্ত ছিল। তিনি স্বয়ং প্রতি রবিবারে সহচরগণ সমভিব্যাহারে প্রতিবেশী ও ভৃত্যগণের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের অভাব ও দুঃখ দেখিতেন। এইরূপ অসাধারণ সদয় ব্যবহার দ্বারা তিনি সকল শ্রেণীর প্রিয় ও প্রতিবাসিগণের পিতা স্বরূপ হইয়াছিলেন।

ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন ও পীড়িতকে ঔষধ পথ্য দান এবং বিপন্নকে বিপদুদ্ধার করা ইত্যাদি বিষয়ে অর্থ ব্যয়কেই সচরাচর লোকে উৎকৃষ্ট দান বলিয়া থাকে, যাহার সৎকার্য্যে দান করিবার ইচ্ছা থাকে, তিনি উপরি উক্ত বিষয় সকলেই দান করিয়া থাকেন। রামদুলালের দানপ্রণালী ইহাপেক্ষাও উদার ছিল। এ সকলত ছিলই; ইহা ব্যতীত অন্যান্য স্থায়ী বিষয়েও তাঁহার অনেক দান ছিল। ইহার কয়েকটি উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। আর একটি এই; তাঁহার জনৈক বন্ধু ও কর্ম্মচারী কাশীনাথ ঘোষ নামক কোন ব্যক্তি রামদুলালের গৃহ পুষ্করিণীর ধারে একটি একফুট মাত্র প্রশস্ত কোটার ভিত্ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। রামদুলাল তদ্দর্শনে

কাশীনাথকে অধিকতর দৃঢ় করিয়া ভিত্তি নির্ম্মাণ করিবার পরামর্শ দিলেন। কাশীনাথ, তাঁহার পরামর্শানুরূপ কাজ করিতে অসমর্থ, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, তিনি নিজ ব্যয়ে কাশীনাথের যাবতীয় নিম্ন-ভিত্তি রচনা করিয়া দিলেন। উহাতে তাঁহার প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়।

বরফ প্রস্তুত করিবার জন্য বর্ণ-হীন শরাবে জল রাখিয়া শীতকালের রজনীতে উপযুক্ত স্থানে রাখা হয়। কখন কখন ঐ জল উপযুক্ত পরিমাণে শীতল হইয়াও কঠিন হয় না। হঠাৎ জলটী নাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জমিয়া যায়। রামদুলালের চরিত্রে ঠিক এইরূপ একটি উদাহরণ আছে। যেন তাঁহার মন, একটী মহৎ কার্য্য সাধনে উন্মুখ হইয়াও কোন অপরিজ্ঞাত কারণে তাহা হইতে নিবৃত্ত ছিল; পরে একটি আকস্মিক ঘটনাসূত্রে কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল। তিনি একদিন আপন বাড়ীর খোলা ছাদে বসিয়া আছেন। কাশী সরকার নামক একজন বাতুল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পিতার নামও রামদুলাল সরকার। এ রামদুলাল, নূতন রামদুলালের পূর্ব্বতন প্রাতিবাসী। প্রতিবেশিগণ, নূতন রামদুলাল হইতে পৃথক্ করিবার জন্য তাহাকে পচা রামদুলাল বলিত। বাতুল ক্রোরপতিকে কহিল,—"রামদুলাল, ও—রামদুলাল, তুমিই আমার পিতাকে পচা

রামদুলাল করিয়াছ। তুমি খ্যাতি ও সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছ। এই দিকে দেখ! দেখি! আমার পদতলে কি?” অসংখ্য পিপীলিকা ধরিয়াছে, এমন একটি মৃত কপোত পথে পড়িয়াছিল, বাতুল তাহাই দেখাইল। রামদুলালের জনৈক পারিষদ বলিয়া উঠিলেন, “তুই পাগল, দেখিতেছিস না;—এ,—একটা মৃত কপোত?” বাতুল উত্তর করিল,—“পাজি, তুই চুপ কর; তোকে আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।” রামদুলাল, উত্তম রূপে দেখিয়া স্মিত মুখে কহিলেন,—“কাশি, এটি মৃত কপোত নয় ত কি?” বাতুল পুনর্ব্বার উত্তর করিল,—“এই কপোত মৃত? তুমি ইহাকে মৃত বলিতে পার! যে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্তের মুখে আত্ম শরীর দান করিতেছে, সে মৃত? আর তুমি নিভৃত বারেণ্ডায় বসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে মুখ ধুইতেছ, তুমি জীবিত?” রামদুলাল যেন পাগলের এই কথার অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সেই দিনই বেলগাছিয়ায় এক অতিথি শালা স্থাপন করিলেন। ঐ স্থানে সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রতিদিন রামদুলালের ব্যয়ে আহার পাইত। সেখানে, এমন সুব্যবস্থা ছিল যে, চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত কাহারই তথায় আতিথ্য গ্রহণে আপত্তি হইতে পারিত না। এতদ্ব্যতীত রামদুলালের নিজ গৃহে প্রত্যহ পাঁচশতেরও অধিক লোক আহার করিত। তাঁহার ভৃত্যগণের প্রতি এইরূপ

আদেশ ছিল, কোন ভিক্ষু এক মুষ্টি চাহিলে, তাহাকে ভিক্ষাভাজন পূর্ণ করিয়া ভিক্ষা দিবে। কোন ব্যক্তি কন্যা ভারগ্রস্ত কি পিতৃমাতৃ হীন হইয়া তাঁহার নিকট সাহায্যার্থী হইলে তিনি কখন কখন এককালে পাঁচশত টাকাও দান করিতেন।

রামদুলাল তাঁহার সন্ততি গণকে, অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে বিশেষ রূপে বিনয় গুণের শিক্ষা দিতেন। তাঁহার একটি কন্যা কোন দরিদ্র কুলীন কুমার কর্তৃক পরিণীতা হইয়াছিলেন। তিনি শ্বশুর গৃহে গমন করিয়া অতি সামান্য কাজ গুলিও স্বহস্তে করিতেন ; বড় মানুষের মেয়ে বলিয়া হাত কোলে করিয়া বসিয়া থাকিতেন না। তিনি পিতৃ দত্ত স্বর্ণাভরণ সকল এই বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন যে, যতদিন তাঁহার যাতৃগণেরও ঐ রূপ আভরণ না হইবে, তত দিন তিনি নিজের আভরণ ব্যবহার করিবেন না। রামদুলাল শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া, নিজ কন্যার ন্যায়, কন্যার যাতৃগণকেও কতকগুলি স্বর্ণাভরণ প্রদান করিলেন।

রামদুলালের বিনয় গুণই, তাঁহাকে সকলের ভক্তি ভাজন করিয়াছিল। তাঁহার প্রকৃতিতে অহঙ্কারের লেশ মাত্র ছিল না। অপমান-ক্লেশ, তাঁহার মনে বৈরসাধন-প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতে পারিত না! অপরিমিত শান্তি, ক্ষতি কারকের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন, দুর্ব্বল ও প্রপীড়ি-

তের রক্ষা করা, ইত্যাদি তাঁহার স্বাভাবিক গুণ ছিল। তিনি তাঁহার প্রত্যেক পুত্রের বিবাহে তিন তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বৃথাড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনার্থ নহে। তদ্দ্বারা কেবল তাঁহার দানের আধিক্য ও সার্থকতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত নবদ্বীপের অধ্যাপক গণের প্রত্যেককে এক এক শত টাকা দান করিয়া ছিলেন। নিমন্ত্রিত গণের ভোজনার্থ উচিতাধিক আয়োজন হইয়াছিল। প্রতিবেশিগণকে একপক্ষ স্ব স্ব গৃহে রন্ধনাদি করিতে দেন নাই। ফলে সে ব্যয় ও ব্যয়ের সুপ্রণালী এখন উপন্যাস হইয়াছে।

ঐ উপলক্ষে সুশৃঙ্খলা রক্ষণার্থ রামদুলালের জামাতা সিপাহী পাহারা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সিপাহীরা ঐ ক্রোরপতিকে কখন স্বচক্ষে দেখে নাই। পরিচ্ছদাদির দ্বারা তাঁহাকে, তিনি বলিয়া চিনিবারও কোন উপায় ছিল না। একদিন বাহির্বাটির আয়োজন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যেমন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবেন, একজন সিপাহী ধাক্কা মারিল। রামদুলাল পড়িয়া গেলেন। তাঁহার আপন বাটির দ্বার রক্ষকেরা ঐ সিপাহীকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু রামদুলাল দৃঢ় রূপে আদেশ প্রচার করিলেন যেন, এই উপলক্ষে তাহাকে কিছু না বলা হয়।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আশুতোষ দেব অত্যন্ত আমোদ প্রিয় ছিলেন। সর্ব্বদা সঙ্গিগণের সহিত নৃত্য গীতাদি বিষয়ক আমোদ করিতেন। একদা কোন উৎসবোপলক্ষে নিজ বাটীর কোন গৃহে নাচ দেখিতে ছিলেন। ঠিক ঐ ঘরের নিম্নতলে রামদুলালের লিখিবার ঘর ছিল। নাচ তামাসার গোলযোগে রামদুলাল বড় বিরক্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ পুত্রকে ডাকাইয়া শান্ত ভাবে কহিলেন, ইহা কাজের লোকের বাড়ী, ওমরাওর বাড়ী নহে।

ঐ আশুতোষ দেব অন্য কোন সময়ে বিখ্যাত কূট-কারী রাজকিশোর দত্তের সহিত একটি ভয়ঙ্কর বিবাদের সূচনা করিয়াছিলেন। রামদুলাল ইহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং রাজকিশোরের নিকট গমন এবং বিনয় নম্র ভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে রামদুলালের অসামান্য বিনয় গুণেই এই গুরুতর বিবাদের ভঞ্জন হয়।

একদা কোন পর্ব্বাহোপলক্ষে কালীনাথ শান্যাল নামক কোন দুর্ব্বৃত্ত রামদুলালের সম্বন্ধীর চকে আবির দিয়াছিল। সম্বন্ধীর হাতে আবির না থাকায় সে পথের ধুলা লইয়া কালীনাথের চক্ষে দেয়। এই অপরাধে কালী নাথ তাহাকে একটা গৃহ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া এমন ভয়া-নক রূপে প্রহার করিল যে, তাহার নাসিকা ও মুখ-বিবর হইতে শোণিত-স্রাব হয়। রামদুলাল আফিস্ হইতে আসিয়া ইহা অবগত হইলেন। দুরাচারের অত্যাচারে

তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল ; এবং ইহাও দেখিলেন যে, ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কিন্তু তিনি পরিশেষে এক নূতন বিধ প্রতিশোধের উপায় স্থির করিয়া অপেক্ষাকৃত স্থিরতা লাভ করিলেন। এদিকে আশুতোষ দেব ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিশোধার্থ উপযুক্ত আয়োজন করিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অপর দিকে, কালীনাথের জ্যেষ্ঠ মথুরানাথকে তাঁহার কতকগুলি ইংরাজ বন্ধু, কনিষ্ঠের দুরাচারিতার জন্য রামদুলালের নিকট স্বয়ং গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দিলেন। মথুরানাথ ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু রামদুলাল মথুরানাথের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্বে জানিতে না পারিলে, হয়ত তাঁহাকে আশুতোষের হস্তে জীবন সমর্পণ করিতে হইত।

রামদুলাল পুত্রগণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া স্বয়ং মথুরানাথকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আপনার উপবেশগৃহ আনিলেন। সজল-নয়নে কাতর স্বরে অঞ্জলি বদ্ধপূর্ব্বক মথুরানাথকে কহিলেন যে, তিনি কি কলিকাতায় বাস করিতে পাইবেন? না কালীনাথের অত্যাচারে তাঁহাকে ভিটা ছাড়া হইতে হইবে? আরও কহিলেন, "তোমার পিতা আমার বন্ধু ছিলেন, মৃত্যু কালে তোমাদের দুইটীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তোমাদিগের প্রতি

স্নেহ মমতা ব্যতীত আর কোন ভাবই প্রকাশ করিতে পারি না। মথুরানাথ, এই কি তাহার পুরস্কার?” এই সময়ে মথুরানাথ ও কালী উভয়েই, রামদুলালের অনুগ্রহ-প্রদত্ত একটী বাটীতে বিনাভাড়ায় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বাস করিতে ছিলেন। রামদুলালের অশ্রু ও বিনয়, মথুরানাথের মর্ম্ম ভেদ করিল। যদি যথা সময়ে রামদুলাল বাধা না দিতেন, তাহা হইলে মথুরানাথ নিশ্চয়ই তাঁহার পদতলে পতিত হইতেন। এই রূপে অপমানের আশ্চর্য্য প্রতিশোধ হইল। রামদুলাল পুনরায় তাঁহাকে, তাঁহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ-ব্যক্তিগণের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন। রামদুলালের পুত্রেরা মনোমত প্রতি বিধান না দেখিয়া বড় অসন্তুষ্ট হইলেন। রামদুলাল এই চিরস্মরণীয় বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। “যদি ষাঁড়ে এক খানি হীরা খাইয়া ফেলে, তবে কি তাহা বাহির করিবার জন্য, ষাঁড়ের পেট চিরিয়া ফেলিতে হইবে?” এই ব্যাপারে রামদুলালের অসামান্য মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তাদৃশ ক্রোধ সম্বরণ ও তাদৃশ অপমান সহ্য করা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। মনোবৃত্তির উত্তেজনায় কার্য্য করা যেমন সহজ, কোন বৃত্তির উত্তেজনাকালে মনকে কর্ত্তব্য পথে লইয়া যাওয়া, অথবা নূতন কিছু স্থির করিতে সমর্থ হওয়া তেমনি কঠিন।

রামদুলাল, এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ঐ কালীনাথ শান্যাল অন্য কোন সময়ে রামদুলালের একজন প্রিয় ও নিরীহ প্রতিবেশীর প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, তাঁহার নিজের প্রতি ও তাঁহার প্রিয়পত্নীর ভ্রাতার প্রতি যে সকল অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা কিরূপে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং কেমন দূরদর্শন ও সুকৌশলের সহিত সে সকলের প্রতিবিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই নূতন অত্যাচার তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিয়াছিল। তিনি মনে করিলেন, এতাদৃশ পশু প্রকৃতি দুরাচার কর্ত্তৃক জন সমাজের ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে। এই জন্য তিনি চেষ্টা করিয়া মাজিষ্ট্রেট্ দ্বারা কালীনাথকে নগর বহিষ্কৃত করিলেন। তদবধি কালীনাথ যাবজ্জীবন আর কলিকাতায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

যখন রামদুলাল তত বড় মানুষ হন নাই, তখন তাঁহাব অন্তঃপুরিকাগণের, বাহির হইতে জলের কলসী কাঁকে করিয়া আনা অভ্যাস ছিল। পরে কলিকাতার মধ্যে প্রধান সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্নের মধ্যে গণ্য হইয়াও, পুর-কামিনী গণের ঐ অভ্যাস প্রচলিত রাখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ সে চেষ্টা সফল হইতে দেন

নাই। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাঁহার নম্রতা, কি অসামান্য প্রকারের ছিল! অসামান্য ছিল তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু তাদৃশ উন্নতাবস্থ লোকের পক্ষে ইহা কিয়ং পরিমাণে, অসঙ্গতও ছিল।

রামদুলাল প্রকৃত হিন্দু। সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি ছিল। তাঁহার জীবনে এই ভক্তিমূলক কতকগুলি সুন্দর আখ্যান প্রথিত আছে। একজন ব্রাহ্মণ অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিয়াও তাঁহার নিকট কোন কর্ম্ম পায় নাই। একদিন রামদুলাল কুঠি যাইতেছেন, হঠাৎ ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার পালকীতে স্কন্ধারোপ করিল। রামদু-লাল বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিয়া লাফাইয়া পড়িলেন এবং সেই দিন তাঁহাকে কোন কর্ম্ম দিলেন।

আমেরিকার জাহাজ উপস্থিত হইলে অনেক অতিরিক্ত সরকারের প্রয়োজন হইত। এই জন্য ঐ সকল জাহাজ উপস্থিত হইবামাত্র একজন প্রধান কর্ম্ম-চারী তাঁহার সম্মুখে একটী উমেদারের তালিকা ধরিত। যাহারা মনোনীত হইত, তদ্ব্যতীত অপরের নাম তিনি স্বয়ং কাটিয়া দিতেন। একজন ব্রাহ্মণের নাম, এইরূপে অনেক বার কাটা যায়। ব্রাহ্মণ বারং এইরূপ দুর্ঘটনা দেখিয়া তালিকা লেখক কর্ম্ম চারী দ্বারা আপন নামের সহিত 'দাঁড়' এই শব্দটী লেখাইয়া রাখিলেন। সময়ানু-সারে ঐ তালিকা রামদুলালের হস্তে পতিত হইল।

তৎকালে ষণ্ড উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। রামদুলাল অন্যান্য নাম কাটিয়া যখন ঐ বিচিত্র নামের উপরে লেখনী সঞ্চালন করিলেন, তখন ঐ ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "কাটিয়া ফেলুন, মহাশয়, কাটিয়া ফেলুন, বারং ব্রাহ্মণ কাটিয়াছেন, এখন গোরুও কাটুন ; ইতস্ততঃ করেন কেন ?" রামদুলাল হাসিলেন এবং ব্রাহ্মণকে একটী সিপ্‌সরকারের কর্ম্ম দিলেন।

অপর এক জন ব্রাহ্মণ টাকা পাইবে বলিয়া তাঁহার নামে লালিস করে। তিনি কাহার নিকট এক কপর্দ্দকও ঋণী ছিলেন না ; বরং ঐ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে তিনিই অনেক টাকা পাইতেন। রামদুলাল ব্রাহ্মণকে জাল খং ও মিথ্যা সাক্ষী দ্বারা মোকর্দ্দমা চালাইতে দেখিয়া বাদীর প্রার্থিত সমুদায় টাকা অবাধে প্রদান করিতে চাহিলেন। ঐ টাকার পরিমাণ ২৪০০০ হাজার। তাঁহার আত্মীয়গণ, অকারণে এত অর্থ অপব্যয় করিতে নিষেধ করিলে রাম দুলাল কহিলেন, "আমি এ মোকর্দ্দমা চালাইলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ জালিয়াতে পড়িবে। ব্রাহ্মণের অনিষ্ট হয়, আমি এরূপ করিতে পারিব না। ২৪০০০ হাজার টাকা প্রদত্ত হইল। এক জন পৌরাণিক হিন্দু, ব্রাহ্মণের প্রতি ঐরূপ অসীম ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু সকল ব্যাপারের যথা স্থানে সীমা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। নচেৎ বহুবিধ অনিষ্ট সংঘটন হয়।

দেনা পাওনার মোকর্দ্দমায় কেহ তাঁহাকে সাক্ষী মানিলে, তিনি কদাচ আদালতে উপস্থিত হইতেন না; বাদীর প্রার্থিত সমস্ত টাকা নিজে অর্পণ করিতেন। বলিতেন,—"গঙ্গাজল স্পর্শপূর্ব্বক সাক্ষীর আসনে দণ্ডায়মান হওয়াপেক্ষা টাকা দেওয়া ভাল।" তাঁহার এই মত জানিতে পারিয়া জুয়াচোরেরা সময়েং তাঁহার অর্থ নষ্ট করিতে লাগিল। পরস্পর বিবাদের ভাণ করিয়া তাঁহাকে মধ্যস্থ স্বীকার করিত। মধ্যস্থতা সূত্রে তিনি কল্পিত মোকর্দ্দমার বিষয় অবগত হইলেই তাহারা আদালতে নালিস করিয়া রামদুলালকে সাক্ষী মানিত। তিনি সাক্ষ্য না দিয়া টাকা দিতেন। পরে জুয়াচোরেরা এইরূপে প্রাপ্ত টাকা অংশ করিয়া লইত।

রামদুলাল অতিশয় কৃতজ্ঞ ছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহার দুঃখের সময় বিন্দুমাত্র উপকার করিত, তিনি তাহা যাবজ্জীবন স্মরণ রাখিয়া উন্নতির সময় এত অধিক পরিমাণে তাহার প্রতিশোধ দিতেন যে, লোকে সেরূপ প্রতিশোধকে অনাবশ্যক জ্ঞান করিত। রামদুলালের হীনাবস্থার সময়ে দোল পর্ব্বাহোপলক্ষে রামদুলালের মাতামহের কুটম্ব বাটী তত্ত্ব পাঠাইবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু কিছুমাত্র সংগতি না থাকায় তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। রামদুলাল তখন নিতান্ত শিশু, দোকানে ধার করিবার অনেক বিফল চেষ্টা পাইলেন। হতাশ্বাসে

রামদুলালের মুখ মলিন হইয়া গেল। অবশেষে কোন দয়ালু ব্যক্তি, তাদৃশ নিরাশ্রয় শিশুকে ধার দিলে পাওয়া যাইবে কি না সে চিন্তা না করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। রামদুলালের অন্তরে ইহা যাবজ্জীবন জাগরূক ছিল। সম্পদের সময় ঐ ব্যক্তির পরিজনদিগকে সন্ধান করিয়া মাসিক ১৫৲ টাকা বৃত্তি অবধারিত করিয়া দেন।

হালা নামক কোন পোর্টুগীজের অধীনে তিনি প্রথমে লাভবান হন। এই জন্য তাঁহার যাবতীয় কাজ কর্ম্মের সহিত ঐ ভাগ্যশালী ব্যক্তির নাম সংসৃষ্ট রাখিয়া ছিলেন ; এবং হালার মরণানন্তর তাঁহার পরিবারেরা দুরবস্থায় পড়িলে তাহাদিগকে বৃত্তি দিতেন।

কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে রামদুলাল যে সকল কার্য্য করিয়া ছিলেন, বর্ত্তমান কালে তাহা প্রশংসার বিষয়, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ অর্থের কখন অপব্যয় হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রণালী, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রয়োজন না থাকিলেও, উপকারীর উপকার করিতেই হইবে, বোধ হয়, বিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতার লক্ষণ এরূপ নহে। কাহার নিকট হইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়া যদি মানুষের উপচিকীর্ষা বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়, তবেই বলা যাইতে পারে প্রকৃত কৃতজ্ঞতার কার্য্য হইল। যেমন মনুষ্য

শরীরের প্রত্যঙ্গ সকল, কোন কারণেই প্রত্যঙ্গ বিশেষের নিকট বাধিত নহে, সকল শরীরের নিকট ঋণী, শরীরের যেখানে যখন যে কার্য্যের প্রয়োজন হইবে, প্রত্যঙ্গ তাহাই করিবে, সে স্থান হইতে কোন উপকার পাইয়াছে কিনা ভাবিবে না। প্রত্যঙ্গ স্বরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ-শরীরের নিকট সেইরূপ ঋণী ;—সমাজে যেখানে যখন যে অভাব হইবে, তৎক্ষণাৎ তৎপূরণের চেষ্টা করিবে। এই কথাটী অধিকতর স্পষ্ট করিবার জন্য, একটী উদাহরণ দেওয়া গেল। মনে কর, দক্ষিণ হস্ত, বাম হস্তে কণ্ডুয়ন করিল, যদি কোন কালে দক্ষিণ হস্তে কণ্ডূয়নের প্রয়োজন না হয়, তবে কি বাম হস্তের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থল নাই? অবশ্য আছে। সে, দক্ষিণ পদের কণ্ডূয়ন করুক। তাহাতেই তাহার কার্য্য হইবে। ফলে, উপকৃত হইয়া, উপকারী হইবার শিক্ষা লাভ করাই, বিশুদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

এইবার আমরা রামদুলালের একটী অধিকতর সমুজ্জ্বল কীর্ত্তির উল্লেখ করিব। তিনি যেখানকার অন্ন বস্ত্রে দুঃখের সময় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, যেখান হইতে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, যেখান হইতে তাঁহার সমস্ত উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই মদনমোহন দত্তের বাড়ীর কালী প্রসাদ দত্ত নামক কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে নিষিদ্ধাচার করাতে জাতিচ্যুত বা সমাজ

বহিভূর্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান লোকেরা সকলেই কালী প্রসাদের বিপক্ষ। রামদুলাল তাঁহার সমন্বয় করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, টাকার দ্বারা সকল কার্য্যই সাধন করা যাইতে পারে। এই জন্য সগর্ব্বে অনেকের সমক্ষে বাক্সের উপর চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, "জাতি ইহার মধ্যে আছে।" তিনি মদনমোহন দত্তের বংশীয় বলিয়া কালী প্রসাদকে, প্রাণপণ যত্নে এবং তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া জাতিতে তুলিলেন।

রামদুলাল কোন্ কালে মৃত্যুর কন্দরে লুক্কায়িত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি কলাপ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি কালী প্রসাদ দত্তের উদ্ধারার্থ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা, অহঙ্কার বা ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনার্থ নহে। কেবল মনুষ্যোচিত দয়া ও কৃতজ্ঞতার উত্তেজনাই তাহার প্রধান কারণ। কেহ কেহ বলেন অহঙ্কার তাঁহার প্রকৃতিতে ছিলনা। একেবারে ছিলনা, একথায় আমাদের বিশ্বাস হয় না। কারণ একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা বিশিষ্ট অহঙ্কার না থাকিলে মানুষ সংসারী হইতে পারে না। অহং—কার, অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, যাঁহার কিয়ং পরিমাণে এ জ্ঞান না থাকে, তিনি নিশ্চেষ্ট পরমহংস। কোন সংসারী ব্যক্তিকে আমরা সে পরমপদ দিতে প্রস্তুত নহি। তবে অহঙ্কার, আত্ম-গৌরব ইত্যাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি

সকল তাঁহার অল্প পরিমাণেই ছিল। মেথরদিগের ঘৃণিত ব্যবসায়ের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। গোঁরা নামক নিজ বাটীর মেথরের শ্রাদ্ধ কালে রামদুলাল স্বয়ং তাহার বাটী গিয়া শ্রাদ্ধের তত্ত্বাবধান করেন এবং ঐ শ্রাদ্ধোপলক্ষে গোঁরার পুত্রকে ১০০০ এক হাজার টাকা দেন। অহম্মুখেরা এরূপ কাজ করিতে পারেন না।

"যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে—" এই মহাবাক্যের নিদর্শন প্রদর্শনার্থই যেন রামদুলালের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার প্রথমা পত্নীর চরিত্রেও উপরি উক্ত রূপ ঔদার্য্য দেখা যাইত। গৃহিণী একবার শ্রীক্ষেত্র গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত গোঁরা তাঁহার সঙ্গে যায়। শ্রীক্ষেত্রের যাত্রিগণ সেই পবিত্র পুরীতে গমন করিয়া এককালে জাতি গৌরব পরিত্যাগ করে। তথায় সকলে চির পোষিত কুসংস্কার ও জাত্যভিমান ত্যাগ করিয়া এক পিতা মাতার সন্তানের ন্যায় পরস্পর ব্যবহার করে। বিশেষতঃ হিন্দু মহিলাগণের ধর্ম্মানুরাগ এত প্রবল যে, তাঁহারা জীবনকালে যতই কেন কুসংস্কার জালে জড়িত থাকুননা, উপযুক্ত কালে কিছুই প্রতিবন্ধক হয় না। গোঁরা তাঁহাকে কহিল ;—"জননি, নিতান্ত নীচ কার্য্যে আমার এ জীবন নিযুক্ত আছে। এই পবিত্র ভূমি ত্যাগ করিলে, আমি আর আপনার নিকটেও আসিতে

পারিব না। অতএব আমাকে এই স্থান-মাহাত্ম্যের অনুসরণে অনুমতি করুন। আমার যে হাত, চিরকাল আপনার কার্য্য করিয়া অশুচি হইয়াছে সেই হাতে এখানকার পবিত্রান্ন আপনার মুখে প্রদান করিতে অনুমতি করুন।” ভিন্নধর্ম্মাবলম্বিনী সুসভ্য রমণীগণ এমন অবস্থায় মেথরের অশিষ্টাচার নিবন্ধন অসন্তুষ্ট হইতেন এবং হয় ত, তাহাকে কশাঘাতের ব্যবস্থাও করিতেন। কিন্তু ঐ ধর্ম্মবীরা হিন্দু রমণী স্মিত মুখে অসঙ্কুচিত ভাবে গৌরাদত্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

কোন সময়ে রামদুলালের কতকগুলি প্রজা রাজস্ব দানে অসমর্থ হওয়ায় মফঃসল হইতে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। রামদুলাল তাহাদিগের শরীর ও পরিচ্ছদে দারিদ্র্য ও দুর্গতির স্পষ্ট লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া মনে বড় কষ্ট পাইলেন। তাহাদিগকে উত্তমরূপে আহার করাইতে এবং সকলকে এক এক খানি নূতন বস্ত্র দান করিতে দেওয়ানের প্রতি আদেশ দিলেন। “যতই কেন ক্ষতি হউক না, কল্য সূর্য্যোদয়ের মধ্যে এই জমিদারী বিক্রয় করিয়া ফেলিব” এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দালালগণকে ক্রেতা উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন। পুত্রগণকে শপথ করাইলেন যেন কস্মিন্ কালে তাঁহারা জমিদারী ক্রয় না করেন। তিনি বণিক্ ছিলেন, বাজারের গতিক বুঝিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে

পারিতেন, প্রজার হৃদয় শোষণ করিতে জানিতেন না। জমিদার হইলে তাঁহার মঙ্গল হইবে না, ইহা যেন তিনি বুঝিয়াছিলেন। পরে তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলনামক একটী জমিদারী, বন্ধক সূত্রে তাঁহার পুত্রেরা ক্রয় করিয়াছিলেন। ঐ জমিদারী রক্ষা করিতেই তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

সত্যপ্রিয়তা ও বাক্‌নিষ্ঠাই তাঁহার তাদৃশী উন্নতির প্রধান সহায়। তাঁহার সময়ে মুৎসুদ্দিদিগের বেতন ছিল না। তাঁহারা টাকা প্রতি দুইপাই দস্তুরি পাইতেন। এই দস্তুরি হইতেই তাঁহারা অতুল বিভব উপার্জ্জন করিয়া যাইতেন। রামদুলাল এই রূপে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ধনবত্তার পরিচয়, পূর্ব্বে অনেক দেওয়া গিয়াছে। আর একটী এই, ক্রীত দ্রব্যের মূল্য স্বরূপে তিনি প্রতিদিন প্রায় তিন লক্ষ টাকার বরাত চিট মহাজনদিগকে দিতেন। মহাজনেরা তাঁহার ব্যাঙ্কের উপর ঐ বরাত দিয়া টাকা লইত। রাম দুলাল কত টাকার মানুষ, পরীক্ষা করিবার জন্য মহাজনেরা একদিন পরামর্শ করিল। প্রতিদিন টাকা না লইয়া প্রায় একসপ্তাহের বরাত চিঠি একদিনে রামদুলালের ব্যাঙ্কে উপস্থিত করিল। তিনি ইহা কিছু পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া অন্যূন ২৫০০০০০ পঁচিশ লক্ষ টাকা

ব্যঙ্কে পাঠাইয়া দেন। মহাজনেরা ব্যাঙ্কে এই টাকার রাশি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। মহাজনেরা বরাত্ত চিঠি দিয়া টাকা না পাইলে তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় সংশয় করিবে, এই সংশয় হইতে সম্ভ্রমের হানি, এবং সম্ভ্রমের হানি হইতে কি নিজের কি মার্কিন হাউসের কার্য্য বিশৃ-ঙ্খলা হইবে। সর্ব্বদা এইরূপ দূরদর্শনের সহিত কাজ করায় সকল কার্য্যে অসাধারণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া-ছিলেন।

রামদুলাল যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন, সকলই অদ্ভুত। বেতন, প্রাচীন আমলাদিগের বৃত্তি প্রভৃতিতে তিনি মাসে ১৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। তিনি ২২২০০০ দুই লক্ষ বাইশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কাশীতে ত্রয়োদশটী শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। পাঁচ দিন ধরিয়া কাঙ্গালী বিদায় হয়। এই কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার গৃহিণী স্বর্ণাদি ধাতু দ্রব্যের সহিত তুলিত হইয়া-ছিলেন। উহা তত্রত্য অধ্যাপকগণকে দান করা হয়।

ঐ ক্রোরপতির শ্রমশক্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তিনি ইংরাজী ভাষায় উত্তমরূপে কহিতে পারিতেন, কিন্তু বর্ণাশুদ্ধি নিবন্ধন ইংরাজী লিখিতে পারিতেন না। কাজের গোলে, সে অভাবের পূরণ করিয়াও উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভা কোন রূপেই প্রতিহত হইত না। বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজী

পত্র লিখিতেন, কেরাণীরা তাহা ইংরাজী অক্ষরে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইত। তিনি প্রতিদিন মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত লেখা পড়া করিতেন। রামদুলালের স্বহস্ত লিখিত একখানি দৈনিক বিবরণ ছিল, সেখানি পাওয়া গেলে তাঁহার চরিত্রের আরও অনেক গূঢ় বিষয় জানা যাইত।

যে পীড়ায় রামদুলালের মৃত্যু হয়, তাঁহার ৬৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। ঐ পীড়ার নাম বাতব্যাধি। একদিন লিখিতে লিখিতে হঠাৎ ঐ পীড়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইল। ভূতলশায়ী হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, যাবতীয় মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশিত হইল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িল, পরিজন ও বন্ধু জনে সেইস্থান সমাকীর্ণ হইল, অন্তঃপুরিকাগণ রোদন করিতে লাগিলেন। দেশীয় চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁহাকে তীরস্থ করা হইল। তীরস্থ হইয়াও তিনি এককালে সংজ্ঞাহীন হন নাই; লৌহ সিন্ধুকের চাবি সবলে ধারণ করিয়াছিলেন। জামাতা রাধাকৃষ্ণ উহা লইবার চেষ্টা করিলে, তিনি অধিকতর বলে উহা চাপিয়া ধরিলেন। পরে পুত্র আশুতোষ ও প্রমথনাথকে সমীপে ডাকিয়া তাহাদের হাতে চাবি দিলেন। এদিকে তাঁহার এই অবস্থার সম্বাদ পাইয়া ফারলি ফরগুসন কোম্পানির অংশী ক্লার্ক ও মেলভিল সাহেব, নিকলসন্ নামক একজন ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া মৃত্যু শয্যায় শয়ান ক্রোর

পতির নিকট উপস্থিত হইলেন ; ডাক্তার, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সত্বর স্বীয় অঙ্গবস্ত্র মধ্য হইতে একটী ক্ষুদ্র সিসি বাহির করিলেন এবং তাহা হইতে এককোটা আরক রামদুলালের ঘাড়ে দিলেন। দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ একটী বড় ফোস্কা হইয়া ফাটিয়া গেল। এই ঔষধের এতাদৃশী কার্য্যকারিতা ইহার পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই। রামদুলাল এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন, সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন।

রামদুলাল একবার মৃত্যুর নৃশংস কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু ক্রমেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। আরও একবার ঐরূপে গঙ্গা-তীর হইতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ৭৩ বৎসর বয়সে ১২৩১ সালে (১৮২৫ খৃঃ) যে এইরূপে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, আর ফিরিলেন না। সেই বর্ষেই তাঁহার জীবন ব্রতের উদ্যাপন হইল। তিনি একদিকে যেমন ভাগ্যবান্, অন্যদিকে তেমনিই গুণশালী। তিনি দীন হীনের পিতা এবং সহায় হীনের সহায় ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মহৎ লোক অল্পই জন্ম গ্রহণ করেন। আশুতোষ দেব এবং প্রমথনাথ দেব নামক দুই পুত্র, গিরীশচন্দ্র দেব পৌত্র এবং পাঁচটী কন্যা তাঁহার শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত ছিলেন। ঐ শ্রাদ্ধে হস্তী, অশ্ব, পালকী, নৌকা প্রভৃতি প্রচুর রূপে দান করা হয়। প্রায়

৩০০০০০ তিনলক্ষ টাকা, কাঙ্গালী বিদায়ে খরচ হইয়াছিল। এক টাকার কম কাহাকেই দান করা হয় নাই। যে সকল দুঃখিনী গর্ভাবস্থায় আসিয়া ছিল, তাহাদের গর্ভস্থ সন্ততিকেও এক এক টাকা দেওয়া হইয়াছিল। যে ব্যক্তির সঙ্গে একটী পাখী ছিল, সেই পাখীটীও স্বপ্রভুর সঙ্গে সমান ভিক্ষা লাভ করিয়াছিল। ফলে, এই শ্রাদ্ধে প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা খরচ হয়।

রামদুলালের জীবন-চরিত পাঠে কি হিন্দু কি খৃষ্টান, কি বালক কি বৃদ্ধ. কি ধনী কি নির্ধন, সকলেই এই কয়টী উপদেশ লাভ করিতে পারেন;—সত্যের সামান্য দীপ, ভয়ানক ঝড়েও নির্ব্বাণ হয় না; মহত্ত্ব সহকারে কেহ জন্মগ্রহণ করে না, কিন্তু চেষ্টা দ্বারা সকলেই মহৎ হইতে পারে। নিজের একটু মনুষ্যত্ব না থাকিলে কেবল মাত্র পরের সাহায্যে কেহই প্রকৃত রূপে বড় হইতে পারে না।

ক্রোরীয়ান্ গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

যখন মুসলমান সম্রাট আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভারতরাজ্য শাসন করিতে ছিলেন; যখন দাক্ষিণাত্যে হিন্দুচূড়ামণি মহারাজ শিবজি হিন্দু স্বাধীনতার পুনঃস্থাপন বাসনায় বিপুল অশ্ব সেনার অধিনায়ক হইয়া রায়গড়ে বদ্ধ-মূল হইতে ছিলেন; যখন সুদক্ষ নবাব সাইস্তাখাঁ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন; যখন ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বনিকেরা পরস্পর প্রতিযোগিতা পূর্ব্বক বাঙ্গালার নানাস্থানে বাণিজ্য বিস্তার করিতেছিলেন; সেই সময়েই সুবিখ্যাত নবদ্বীপের অগ্নি কোণে কামারকুলি* নামক গ্রামে একজন প্রধান বাঙ্গালী প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহারই নাম গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গদেশের বিষয় যতই আলোচনা করা যায়, ততই অবসন্ন হইতে হয়। অধুনাতন বঙ্গবাসি-গণ আপনাদিগকে চালাক ও কাজের লোক বলিয়া মনে মনে কতই সন্তুষ্ট হন এবং লোকের নিকট অহঙ্কার প্রকাশ করিতেও

---

* কামার কুলির কিঞ্চিৎ দক্ষিণে রামচন্দ্রপুর, এই রামচন্দ্রপুরে সুবিখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মঠ আছে।

ত্রুটি করেন না। কিন্তু দেখেন না যে, তাঁহাদের দেশের একখানা প্রকৃত ইতিহাস নাই। যে জাতির ইতিহাস নাই, সে জাতির কিছুই নাই। সভ্য জাতিরা তাহাদিগকে মানুষ জ্ঞান করেন না। এইজন্যই বর্ত্তমান রাজপুরুষগণের নিকট বাঙ্গালী জাতির তাদৃশ আদর নাই। যদি বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন অবস্থার প্রকৃত ইতিহাস থাকিত, যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জীবন-চরিত থাকিত, যদি পূর্ব্বতন সামাজিক আচার ব্যবহার বিষয়ক গ্রন্থাদি থাকিত, তাহা হইলে আর আমাদিগকে পদ্মা ও ভাগীরথীর অন্তর্গত আধুনিক চরবাসী বা বন-বাসী বলিয়া উপেক্ষিত হইতে হইত না। তাহা হইলে আমরা "বড় ঘরানা" বলিয়া আদর পাইতাম এবং সভ্য ও প্রবল জাতিগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতাম। উপরি উক্ত ব্যক্তির জীবন-চরিত সম্বন্ধে যেরূপ গল্প শুনা যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থে তাহার গন্ধও নাই। ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়! অথচ তাদৃশ ব্যক্তির তাদৃশ কার্য্যই ইতিহাসের প্রধান বিষয়। নবাব মুর্সিদ্-কুলী, জাফর খাঁর সময়ে, নাজির আহাম্মদ, সইয়দ্ রেজাখাঁ, সইয়দ্ ইক্‌রাম খাঁ প্রভৃতি মুসলমান রাজ-পুরুষেরা বাঙ্গালার রাজস্ব সম্বন্ধে যে কার্য্য করিতেন, একজন বাঙ্গালীও আপন পুত্রের সহিত সেই সময়ে বহুবৎসর তাদৃশ কোন কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং

তদ্দ্বারা আপন অবস্থা সমুন্নত করিয়া বিবিধ কীর্ত্তি-কলাপ দ্বারা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন; ইতিহাসে পাঠ না করিলে ইহা কি রূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে ঐ বাঙ্গালীর পদ, উপরি উক্ত মুসলমান রাজপুরুষগণের পদ অপেক্ষাও উচ্চতর ছিল বলিয়া বোধ হয়। হয়, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জীবন-চরিত সম্বন্ধে বঙ্গদেশীয় জনশ্রুতি মিথ্যা বলিতে হয়, নয়, মুসলমান লেখক, ইতিহাস হইতে বাঙ্গালীর নাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। এই উভয় তর্কের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সিদ্ধান্ত করিলে বোধ হয় যে, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর যাদৃশ উচ্চ পদের গল্প শুনা যায়, বাস্তবিক তাদৃশ পদ তাঁহার হয় নাই। ফলতঃ যেমন শুনা যায় সেরূপ না হইলেও, যখন ডেং গবর্ণর রাজা রাজবল্লভ, পেস্কার দর্পনারায়ণ প্রভৃতি দেশীয় গণের নাম ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, তখন বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার "ক্রোরীয়ান্" বলিয়া খ্যাত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বিষয় বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবৃত হওয়া নিতান্তই উচিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যখন ইতিহাসে কোন প্রমাণ নাই, তখন কেবল মাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জীবন-চরিত-সম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

নবাব সাইস্তাখাঁর সময়ে কামারকুলিতে এক ঘর

দুঃখী বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। সাধ্বী স্ত্রী এবং ৭।৮ বৎসর বয়স্ক একটী পুত্র সন্তান লইয়া ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। বালকটী অতি দুষ্ট স্বভাব। একদিন প্রতিবাসী বালকগণের সহিত খেলা করিতে করিতে কে কি দিয়া ভাত খাইয়াছে, সেই কথা উঠিল। সকলের কথা ফুরাইলে একটী বালক কহিল, "আমার মা যেরূপ লাউ চিংড়ি রাঁধিয়াছিলেন, তোমরা কেহই সেরূপ খাও নাই।" আমাদের বালক গৃহে আসিয়া মাতার নিকট লাউ চিংড়ি খাইবার প্রস্তাব করিলেন। মাতার হাতে কপর্দ্দকমাত্র নাই যে, তদ্দ্বারা মাচ ক্রয় করেন। এদিকে বালকের ভয়ানক আব্দার; এমন সময়ে হঠাৎ একজন মৎস্যবিক্রয়িণী গৃহে উপস্থিত হইল। জননী, উপায়ান্তর না দেখিয়া ধারে মাচ কিনিলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন "ফিরিয়া যাইবার কালে দাম লইয়া যাইও।"

লাউ চিংড়ির আয়োজন হইল দেখিয়া গোবিন্দের আনন্দের সীমা নাই। খেলিতে বাহির হইলেন। জননী পাক প্রস্তুত করিলেন। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। মৎস্য বিক্রয়িণী পাড়ায় পাড়ায় মাচ বেচিয়া ফিরিয়া আইল। মাঠাকুরাণীর নিকট পয়সা চাহিল। তিনি বলিলেন,—"বাছা পয়সাত হাতে নাই,—আর একদিন লইও,—আজ এস।" ইহাতে মেছুনী অসন্তুষ্ট হইয়া

যার পর নাই গালি গালাজ করিল। কেহ কেহ বলেন সে রন্ধন করা মাচ, তরকারী হইতে বাছাইয়া লইয়া গিয়াছিল। ঠাকুর এই ব্যাপার অবগত হইয়া বড় বিরক্ত হইলেন। পুত্রের জন্য ছোট লোকের গালি খাইতে হইল বলিয়া স্ত্রীর সম্মুখে পুত্রোদ্দেশে অনেক তিরস্কার করিলেন। ইতিমধ্যে গোবিন্দ গৃহে আসিয়া আহার করিতে বসিলেন। গোবিন্দ মাছের তরকারীতে মাছ না পাইয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"মাছ কই ?" জননী রোদন করিতে করিতে মেছুনীর বৃত্তান্ত বলিলেন। কেহ কেহ বলেন, কর্ত্তার আদেশে গোবিন্দকে ছাই খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। ঘটনা যাহাই হউক, ফলে দারিদ্র্য নিবন্ধন এই ব্যাপার উপলক্ষে গোবিন্দের মনে একটি বিলক্ষণ আঘাত লাগিয়া ছিল। ভোজন হইতে বিরত হইয়া সেই আট বৎসর বয়স্ক বালক বলিলেন, "মা, আমার নিমিত্ত ভাবিও না, যদি টাকা উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে আবার ঘরে ফিরিয়া আসিব, নতুবা এই জন্মের শোধ বিদায় লইলাম।" এই কথা বলিয়া গোবিন্দ বাটী হইতে বাহির হইলেন।

গোবিন্দ কোথা যাইবেন, কি করিবেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য স্থির নাই। ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী তাল গাছে পাখীর ছা হইয়াছে। পক্ষি-শাবক গ্রহণে লোলুপ হইয়া বৃক্ষে

আরোহণ করিলেন ; কোটরে যেমন হস্ত প্রবেশ করাইবেন, একটী বিষধর সর্প তন্মধ্য হইতে অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত হইয়া দংশনে উদ্যত হইল। এমন অবস্থায় ভয়ে অভিভূত হইয়া গাছ হইতে পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। কিন্তু গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ এরূপে সাঁপের গলা টিপিয়া ধরিলেন, যে, সে আর দংশন করিতে পারিল না। কিন্তু লাঙ্গুল দ্বারা তাঁহার হস্ত জড়াইয়া ধরিল। গলা ছাড়িয়া দিলে দংশন করে ; এদিকে এক হস্তের আশ্রয়ে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করাও সুকঠিন। প্রস্তুত-বুদ্ধি বালক আপনাকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া তখনি একটী সদুপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিলেন। যে ক্ষমতা, নিরাশ্রয় দুঃখী বালককে ভবিষ্যতে সম্ভ্রম জনক ও গুরুভার-বহ রাজকীয়পদে উন্নত করিয়াছিল, পাঠকগণ তালিতরুর শিখর দেশে নাগপাশ-বদ্ধ সেই বালকের নবীন জীবনে অদ্য তাহার অঙ্কুর দেখিতে পাইবেন। গোবিন্দ কোন রূপে অপর হস্ত দ্বারা লাঙ্গুলের অগ্রভাগ ধরিয়া এক এক বেড় খোলেন, আর তালীয় খড়্গো * ছিন্ন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

---

* তালের বাগুলা, দুই ধার করাতের ন্যায়। উহাকে তালীয় খড়্গা বলে।

কথিত আছে, তিনি তৎকালে নির্দ্দিষ্ট গুণ বিশিষ্ট একটী শিষ্যের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সহসা তাল বৃক্ষোপরি দৃষ্টি সংযোগ হওয়ায় এক অদ্ভুত নাট্যের অভিনয় দেখিলেন। মনে মনে স্থির করেন, সেই বালকই, তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য হইবে। বালক আরব্ধ কর্ম্ম শেষ করিয়া গাছ হইতে নামিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে, ভাল হইবার আশা দিয়া, সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিলেন। গোবিন্দ বলিলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি পাখীর ছা দিতে পারেন, তবে তিনি তাঁহার সঙ্গে যান। সন্ন্যাসী পক্ষি-শাবকের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে মন্ত্র গ্রহণ করাইয়া, মন্ত্র সিদ্ধির উপায় বলিয়া দিলেন এবং কহিলেন, 'গোবিন্দ; ভবিষ্যতে তুমি বড় লোক হইবে; কিন্তু অস্ত্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে।' পরিব্রাজকের এই এই সকল ভবিষ্যৎ বাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসীর সঙ্গে দিল্লী যান।

কথিত আছে সন্ন্যাসীর বরে বিনা যত্নে আরবী ও পারসী ভাষায় নানা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ, আরবী ও পারসী ভাষায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন একথা যেমন সত্য; অন্যদিকে, বিনা যত্নে বিদ্যাভ্যাস হয় না, এটীও সেইরূপ সত্য। অতএব এমন স্থলে উপরি-উক্ত জনশ্রুতি, সহজেই মিথ্যা বলিয়া বোধ করা

যাইতে পারে। অনুমানে ইহাই প্রতীত হয় যে, হয়, প্রোক্ত দুই ভাষায় সন্ন্যাসীর জ্ঞান ছিল, তিনি স্বয়ং গোবিন্দকে শিক্ষা দেন; না হয়, দিল্লীতে তাঁহার তৎকাল প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। অল্প সময়ে ও অল্প শ্রমে তাদৃশ বিদ্যা উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, লোকে বলে 'বিনা যত্নে সন্ন্যাসীর বরে বিদ্বান্ হইয়াছিলেন।' ফলতঃ এতাদৃশ প্রতিভা-সম্পন্ন বালকের শিক্ষ গ্রহণ বিষয়ে অনেক কৌতুক ও আমোদ জনক উপদেশ পাইবার আশা করা যাইতে পারে; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার সবিশেষ বিবরণ কিছুই সংগ্রহ করা যায় না।

গোবিন্দ, বাল্য স্বভাবের বশীভূত হইয়া আরবীর সুললিত কবিতা, মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে ২ দিল্লীর নগর-পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন; তাহা, তৎকালীন সম্রাটের রায় রাঁইয়ার * কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বালককে নিকটে আহ্বান করেন। দেওয়ান আকৃতি প্রকৃতি এবং বদন শ্রীতে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ দেখিয়া গোবিন্দকে বড় ভাল বাসিলেন। আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার উন্নতি সাধন কল্পে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। তিনি দেওয়ানের অনুগ্রহে বহু দিন এই স্থানে থাকিয়া বহুবিধ বিষয় কার্য্য শিক্ষা ও

---

* দেওয়ান

কাজ কর্ম্ম করেন। শেষে, যে কার্য্য করিয়া প্রচুর সম্পত্তি ও দেশাবচ্ছিন্নে খ্যাতি লাভ করেন, এই স্থান হইতেই তাহার সূত্রপাত হয়।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, দেওয়ানের অনুগ্রহে ক্রমান্বয়ে অনেক রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হন। দেওয়ান অপাত্রে অনুগ্রহ বিতরণ করেন নাই। তিনি, গোবিন্দের অসাধারণ গুণ ও কার্য্য-ক্ষমতা দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে বাধিত হন। নিজের একটু মনুষ্যত্ব না থাকিলে, কেবল মাত্র পরানুকূল্যে, কেহ প্রকৃত বড় লোক হইতে পারেন না। অনেকে সহায় নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন, কিন্তু অকারণ সহায় অতি অল্প লোকের থাকে। যাহা হউক, গোবিন্দ, ক্রমে সম্রাটের গোচর হইলেন। এই ঘটনাতেই তাঁহার গুণ ও ক্ষমতার পর্য্যাপ্ত পুরস্কার হইল। কার্য্য ও কারণ উভয়ে এরূপ আশ্চর্য্য সম্বন্ধ-যুক্ত যে, তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র বৈষম্য থাকিবার যো নাই। আপাত দৃষ্টিতে বোধ হইতে পারে, গোবিন্দের যেরূপ যোগাযোগ হইল, যাহার সম্বন্ধে সেরূপ হইবে তাহারই তাদৃশী উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কার্য্য কারণের ভাব পর্য্যালোচনা করিলে, বোধ হইবে, যোগাযোগ আপনি হয় না। এ সংসারে কয় ব্যক্তি, অত্যুচ্চ তালিতরু-শিখরে তাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াও তাদৃশী প্রস্তুত-বুদ্ধি প্রদর্শনে সমর্থ হয়?

তৎকালীন সম্রাট একদা গোবিন্দকে দেখিতে চাহিলেন। দেওয়ান, সম্রাট সাক্ষাৎ করণোপযোগী আয়োজন করিয়া দিলেন। গোবিন্দ, স্বকীয় বিদ্যা, বুদ্ধি ও কার্য্য-দক্ষতা প্রদর্শনে সম্রাটের এতাদৃশ স্নেহ ও সন্তোষ আকর্ষণ করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে প্রার্থনার অধিক পুরস্কার দানে বাধিত হইলেন। বাদসা, 'বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা' এই তিনটি শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক্ পদ সঞ্চালনে নিকটস্থ তিনটী তাকিয়া স্থান ভ্রষ্ট করিলেন গোবিন্দ ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া একপ্রকার অসন্তুষ্ট হইয়াই রাজ সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। দেওয়ানজীকে কহিলেন, 'মহাশয়, এমন বাতুলের নিকটও আমাকে পাঠাইয়া ছিলেন।'

গোবিন্দের প্রতি বাদসার বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া দেওয়ানের কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইয়াছিল, পাছে দেওয়ানী পদ গোবিন্দকে প্রদত্ত হয়। গোবিন্দের সহিত সম্রাটের সাক্ষাৎ ও 'তিন তাকিয়ে ইলাম' হইয়া গেলে দেওয়ান-জীর সে শঙ্কা অন্তরিত হইল।

পূর্ব্বতন মুসলমান সম্রাটদিগের সভায়, সিংহাসনের সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে কতকগুলি 'তাকিয়া' থাকিত। ঐ সকল 'তাকিয়া' ভিন্ন ভিন্ন সুবার নামে অবিহিত হইত। 'তাকিয়া ইলামের' অর্থ এই, কোন ব্যক্তিকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইলে, সে তত্তৎসুবার কোন প্রধান

রাজকর্ম্ম পাইবার অধিকারী হইত। তদনুসারে গোবিন্দ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা এই তিন সুবার 'ক্রোরীয়ান' অর্থাৎ রাজস্ব সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রধান পদে অভিষিক্ত হইলেন। বাঙ্গালার নবাবের অধীন থাকিয়া কাজ করিতে হইত বটে, কিন্তু সে অধীনতা নামমাত্র। বাঙ্গালা বলিলে তৎকালে উপরি উক্ত তিন প্রদেশ বুঝাইত। গোবিন্দ একরূপ স্বাধীন ভাবেই বাঙ্গালার রাজস্ব নির্ণয় ও আদায় করিতেন। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ব হইতেই, বঙ্গদেশ দ্বাদশটী ক্ষুদ্র রাজ্যে * বিভক্ত ছিল। কথিত আছে; সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময়ে যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্য ঐ বারটি রাজ্য স্বায়ত্ত করেন। এ কথা সত্য বোধ হয় না। অথবা সত্য হইলেও, ঐ রাজ্যগুলি অধিক কাল আত্ম-বশে রাখিতে পারেন নাই। যেহেতু গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর সময়ে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বস্থলীতে ঐ বার জন রাজার বারটী বাসা বাটী ছিল। ঐ বাসাবাটী সকল "বারভূম" বলিয়া খ্যাত ছিল। রাজস্ব সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি করিবার জন্য বঙ্গরাজগণের কর্ম্মচারীরা উপরি উক্ত বাসা বাটী সকলে অবস্থান করিত। কখন ২ প্রয়োজন মতে, গোবিন্দের সহিত বা

---

* বর্দ্ধমান, যশোহর; পাটলি, কৃষ্ণনগর, সাতসইকে, সমুদ্রগড়, আশাম, কিতব, যক্ষপুর ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী তৎপদাভিষিক্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বয়ং রাজারাও তথায় আসিতেন।

গোবিন্দ, শেষাবস্থায় কামার কুলির বাটী ত্যাগ করেন। কারণ তৎকালে ঐ বাটি গঙ্গাগর্ভসাৎ হয়। পূর্ব্বস্থলীর বাটির তিনদিকে গড় কাটা হইয়াছিল, অপর দিকে গঙ্গা স্বয়ং গড়ের কার্য্য করিতে ছিলেন। বাসবাটী ব্যতীত গঙ্গাতীরে অট্টালিকাময় ঠাকুর বাটী ছিল। তথায় একশত আটটি শিব মন্দির ছিল। তদ্ব্যতীত রাধাকান্ত, রাধাবল্লভ, কৃষ্ণদেব এবং মদনগোপাল এই চারিটি দেব বিগ্রহ ছিলেন। গোবিন্দ পশ্চিম হইতে আগমন কালে তৎকালীন জয়পুরপতির নিকট প্রথম বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। দেবালয়ের সহিত সংযুক্ত স্বতন্ত্র অতিথিশালা ছিল। গোবিন্দ, ঐ সকল দেবসেবা এবং অতিথিসেবা, মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। শ্রুত আছে, তিনি অত্যন্ত বদান্য ছিলেন।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তিনটি শ্রেণী আছে। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বৈদিক। এই শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে জাতিগত ভিন্নতা কিছুই নাই। কিন্তু সকলেই আপন ২ শ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত পবিত্র মনে করেন। সেটি কেবল তাঁহাদের মনের ভ্রম মাত্র। কার্য্যে কাহারও অধিক প্রাধান্যের প্রমাণ পওয়া যায় না। বরং সকলেই সমান এইরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকাশ্যরূপে

এই শ্রেণীত্রয়ের মধ্যে আহার ব্যবহার বা বিবাহাদি সম্বন্ধ হইতে পারে না। অথচ কেহ কাহার অন্ন গ্রহণ করিলে, তাহাকে স্বশ্রেণী হইতে পতিত হইতে হয় না; এবং ঐ শ্রেণী সকলের মধ্যে গুরু শিষ্য সম্বন্ধও প্রচলিত আছে। যাহা হউক, একজাতির মধ্যে এইরূপ অমূলক ভিন্নতা থাকায় অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ প্রচলিত হইলে ব্রাহ্মণ জাতির অনেক মঙ্গল হইতে পারে। এই তিন শ্রেণী একত্র হইলে কিরূপ মঙ্গল হইতে পারে এবং পৃথক্ থাকায় কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহার সূক্ষ্ম বিচার এগ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। যাহা হউক, এই তিন শ্রেণীকে একত্রিত করিবার জন্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে তিন শ্রেণীতে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পত্নীর সন্তান হইয়াছিল। কিন্তু বৈদিকপত্নীর গর্ভজাত সন্ততিগণ ব্যতীত, আর কেহই জীবিত ছিল না। তাঁহার অপর সন্তানেরা জীবিত থাকিলে এবং পরবংশীয়েরা এই নূতন প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিলে কোন ফল হইত না এ কথা বলা যায় না। ফলতঃ গোবিন্দের এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠের নাম রূপরাম, কনিষ্ঠের নাম মুকুট-রাম। বোধ হয়, কর্ম্মসূত্রে, রাজসংসার হইতে রায়

উপাধি পাইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার পরবংশীয়েরা রায় উপাধিতেই খ্যাত হন।

কথিত আছে, একদা আহ্নিক করিতে করিতে হঠাৎ গোবিন্দের মৃত্যু হয়। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার ছিন্ন মস্তক গৃহ তলে পতিত, শরীর রুধিরাভিষিক্ত ও গৃহ তলে লুণ্ঠিত হইতেছে, তৎকালীন পরিজনেরা, তাঁহার এইরূপ পরিণাম দেখিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার এইরূপ মৃত্যুতে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন, গোবিন্দ ছিন্নমস্তার মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; এইজন্য তাঁহার ঐ রূপে মৃত্যু হইয়াছিল। তন্ত্রের রহস্য উদ্ভেদ করা সহজ ব্যাপার নহে। পুরাণে গ্রথিত আছে, মহারাজ লঙ্কাধিপতি আপনার ছিন্ন মস্তক দ্বারা ইষ্টদেবের প্রীতি সাধন করিয়াছিলেন। গোবিন্দের ইষ্টদেব পূজাও সেইরূপ কিনা, নিশ্চয় বলা যায় না। এরূপ মৃত্যুর বহুবিধ হেতু কল্পনা করা যাইতে পারে। কোন কারণ বশতঃ একজন মুসলমান নবাবের সহিত তাঁহার বিবাদ হইয়াছিল, এরূপ শ্রুত আছে। সেই নিষ্ঠুর নবাবের ষড়যন্ত্রে গোবিন্দের তাদৃশী মৃত্যু ঘটিতে পারে। অথবা তাঁহার যে কার্য্য করিতে হইত, তাহাতে এতদ্দেশীয় তৎকালীন রাজগণের সহিত মনোবাদ হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিম্বা যে গুরুর প্রসাদে তাঁহার তাদৃশী উন্নতি হইয়াছিল, সেই গুরুর বাক্য সার্থক করিবার জন্য আত্ম-ঘাতের প্রবৃত্তি

হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব নহে। সুজা উদ্দিনের রাজ্য আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বঙ্গদেশে মুকুট রায় বলিয়া খ্যাত; নিম্নে তাঁহার এইরূপ খ্যাতির কারণ প্রকাশ করা যাইতেছে। একথা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে;—তাঁহার দুইটী পুত্র, রূপরাম রায় এবং মুকুটরাম রায়। কনিষ্ঠ মুকুটরাম রায়, অধিকতর বিদ্যাবান্, সদ্‌গুণশালী ও কার্য্যদক্ষ হইয়াছিলেন। পিতা বর্ত্তমানেই ক্রোরীয়ানের কার্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। পিতাও তাঁহাকে সম্যক্ উপযুক্ত দেখিয়া, সকল কার্য্য তাঁহার নামে চালাইতেন। গোবিন্দের অপেক্ষা, মুকুট অধিক কাল ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে মুকুট, রাজগণের সহিত অধিক রুক্ষ ব্যবহার করিতেন। কারণ, খাজনা আদায় সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার পীড়াপীড়ির ঘটনা, পূর্ব্বস্থলীতেই ঘটিয়াছিল, এইরূপ শুনা যায়। গোবিন্দ পূর্ব্বস্থলীর বাটীতে অধিককাল বাস করেন নাই। প্রায় তাঁহার পরলোক সময়েই, তত্রত্য বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দের পূর্ব্ব নিবাস কামারকুলিতে "বারভুমের" কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মুকুট রায়ের কর্ত্তৃত্বে এবং তাঁহার অভিপ্রায় মতেই পূর্ব্বস্থলীর বসতবাটী, দেবায়তন,

কাছারী বাড়ী; নহবতখানা, হাওয়াখানা, ইত্যাদি "আমিরী" ধরণের বাড়ী ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই যাবতীয় অট্টালিকাময় গৃহাদি, এক অত্যুচ্চ দুরারোহ প্রাকারে বেষ্টিত ছিল। ইহাকে "চৌদালী" কহিত। দক্ষিণে পাঠানেরা তোরণ রক্ষা করিত এবং উত্তরে বাগ্‌দী জাতীয় তীরন্দাজ ও তলোয়ার বরজ চোয়াড়েরা খড়্‌কী দ্বার রক্ষা করিত। বাটীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে অন্যান্য কর্ম্মকর কায়স্থাদি জাতির আবাস ছিল। কালক্রমে তাহারা তত্তৎ স্থানের অধিবাসী হইয়াছে। অদ্যাপি পূর্ব্বস্থলীতে ঐ সকল অধিবাসীর অবশেষ বর্ত্তমান আছে। মুকুটরামের সময় ক্রিয়াকাণ্ডের কিছু বাহুল্য হইয়াছিল। তিনি অতি সমৃদ্ধির সহিত খিড়্‌কির পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ কার্য্যে মিথিলার অধ্যাপকগণও আগমন করেন। ঐ সময়ে অন্যরূপেও অনেক সদ্ব্যয় হইয়াছিল।

বাবুগিরি করা, সদ্ব্যয়াদি দ্বারা দেশাবচ্ছিন্নে সুখ্যাতি লাভ করা, বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন দ্বারা ছোট বড় সকলের কাছে সম্ভ্রম বৃদ্ধি করা ; এ গুলি কর্ত্তার ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। পৃথিবীতে ইহার ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ত্তার ভাগ্যে ঘটে না, তাহার বিশেষ কারণই আছে। অর্থ উপার্জ্জনের পথ আবিষ্কৃত করিতে এবং অর্থোপার্জ্জন করিতেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ

ও উৎকৃষ্টাংশ অতিবাহিত হইয়া যায়; পরবংশীয়েরাই ধন ভোগের অধিকারী। মুকুটরাম রায় বড় লোকের সন্তান হইয়াই উচ্চপদে আসীন হইয়াছিলেন, তাঁহাকে গোবিন্দের ন্যায় মেছুনীর গালি খাইয়া, পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া "টাকা রোজগার" করিবার জন্য গৃহ-ত্যাগ করিতে হয় নাই। তাঁহাকে অযত্ন-রক্ষিত নিরভি-ভাবক বালকের ন্যায় তালগাছে উঠিয়া বিপদে পড়িতে হয় নাই; তাঁহাকে সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া দেশে ২ ভ্রমণ করিতে হয় নাই। তাঁহাকে পরান্নভোজী হইয়া স্বজন শূন্য দূরদেশে থাকিয়া লেখা পড়া শিখিতে হয় নাই। তাঁহাকে হঠাৎ উচ্চপদ লাভের বিষম-সঙ্কট সকল অতিক্রম করিতে হয় নাই। তিনি একেবারেই নির্ব্বিঘ্নে বড়লোক হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অবসর পাইয়া ছিলেন। এইজন্যই তাঁহার অধিকতর যশঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছিল। এইজন্যই তাঁহার আড়ম্বরানু-গামিনী খ্যাতিতে; পিতৃ-কৃত্য পর্য্যন্ত বিলীন হইয়াছিল। এইজন্যই, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, এদেশে মুকুটরাম রায় বলিয়াই খ্যাত হইয়াছিলেন।

"নবদ্বীপ অঞ্চলের কে একজন, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিদেশে গিয়া বড়লোক হইয়া আসি-য়াছে" ইত্যাদি সম্বাদ, গোবিন্দের বাল্য বিবরণের সহিত প্রথমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। তাঁহার অধ্যবসায়,

আত্মাবলম্বন, সদাশয়তা প্রভৃতি* ক্রমে প্রচারিত হওয়ায় "লোকটি,—কে ?" জানিবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা হইতে পারে; কিন্তু তৎকালে এদেশে মহৎ ব্যক্তির জীবন-চরিত অনুসন্ধানের প্রকৃত রীতি প্রচলিত না থাকায়, মুকুটরাম রায়ই, অনুসন্ধিৎসুগণের নেত্রে পতিত হইলেন। যেহেতু গোবিন্দ তাহার অনেক পূর্ব্বে অনধিক চারি পাঁচ বৎসর মাত্র রাজ কার্য্য করিয়া পরলোক গত হইয়াছিলেন। অথচ অনুসন্ধান-কালে মুকুটরাম রায়ই, অধিকতর সমৃদ্ধির সহিত পিতৃপদে অভিষিক্ত ছিলেন। যখন লেখা পড়ার সাধারণ চর্চ্চা অধিক ছিল না, কোন বিষয়ের স্বরূপ নির্ণয়ে লোকের তত ইচ্ছা ছিল না, বঙ্গদেশের তাদৃশী অবস্থায়, এক জন; আর এক জন বলিয়া খ্যাত হওয়া বড় অসম্ভব নহে।

যে সকল গুণের প্রভাবে মানুষ সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন; অধ্যবসায়, আত্মাবলম্বন, সাহস, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি সেই সকলের মধ্যে প্রধান। গোবিন্দের জীবনে প্রথমাবধি ঐ গুণ গুলি ছিল বলিয়াই, তিনি তাদৃশী উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি যখন সম্পূর্ণ বালক, পাখীর ছা পাইলে যেখানে সেখানে যাইতে পারিতেন, তখনই তাঁহাতে ঐ সকল গুণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। যে বয়সে অন্য বালক স্বগ্রাম মধ্যে একাকী বেড়াইতে সাহস করে না, সন্ধ্যার

পর রুদ্ধ-দ্বার গৃহ মধ্যে থাকিয়াও "ভূত প্রেতিনীর" ভয়ে চমকিয়া উঠে, গোবিন্দ সেই বয়সে অর্থোপার্জ্জন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন। কোথা যাইবেন, কি করিবেন, কে তাঁহার সহায় হইবে, তখন এ সকলের স্থিরতা ছিল না। তিনি আপনি, আপনার অবলম্বন হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন। গৃহ ত্যাগ করিয়াই, তালীর তর্কশিখরে অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অসীম সাহসের পরিচয় দেন। পক্ষিশাবকের প্রত্যাশায় সন্ন্যাসীর সঙ্গে যথা তথা যাইতে সম্মত হওয়ায়, একদিকে যেমন বালকতা, অন্যদিকে, তেমনি সাহস প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার বাল্য-জীবন পর্য্যালোচনা করিলে, কাহার না অন্তরে উৎসাহ-স্রোতঃ প্রবাহিত হয়? কাহার না, দুঃখের দশায় পড়িয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য ঘর ছাড়িতে সাহস হয়? কাহার না পর প্রত্যাশী হইয়া মনুষ্য জীবনকে কলঙ্কিত করিতে ঘৃণা হয়? কাহারই বা আলস্যবশে বিবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে ইচ্ছা হয়?

যে স্থলে পার্থক্য দ্বারা অনিষ্ট-সংঘটন হয়, অথবা ইষ্টোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে, সেই স্থলে যিনি একীকরণের চেষ্টা করেন, তিনিই মহৎ। ইষ্টানিষ্টের লাঘব গৌরব অনুসারেই, মহত্ত্বের তারতম্য

হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, রাজ্য, জাতি, বর্ণ ইত্যাদির মধ্যগত বিভিন্নতাকে লক্ষ্য করিয়াই লাঘব গৌরবের কথা উত্থাপিত হইতেছে। ধর্ম্ম যে সংসারের একটী প্রধান বস্তু এবং উহার পার্থক্যের বিষয় অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। এই জন্যই খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম-সংস্কারকগণ সর্ব্বজাতীয় লোককে এক ধর্ম্মে আহ্বান করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় ভক্তি ও সম্মান লাভ করিতে আর কে পারিয়াছেন? এইজন্যই, প্রাসিয়ান্ রাজমন্ত্রী কাউণ্ট বিস্মার্ক জর্ম্মনির ক্ষুদ্ররাজ্য সকলকে একীভূত করিয়া তাদৃশ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। এইজন্যই বুদ্ধাবতার সকল জাতিকে একত্র একান্ন * ভোজন করাইয়া এত মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছেন। এইজন্যই আমরা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তিকে মহৎ ও সদাশয় বলিতে অধিকার লাভ করিয়াছি। এস্থলে কেহ যেন এমন মনে করিবেন না যে, গোবিন্দ উপরি উক্ত মহাত্ম-গণের সহিত সর্ব্বাংশে তুলিত হইলেন। কেবল কার্য্যগত আংশিক সাদৃশ্য হেতুই এস্থলে তাঁহার নাম গৃহীত হইল।

---

* শ্রীক্ষেত্রের, সকল জাতির একত্রে অন্নগ্রহণ প্রণালী, বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিনি রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ও বৈদিক এই তিন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বর্গের একীকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার সদাশয়তা ও মাহাত্ম্যের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ। সুনীতি শিক্ষা করা এবং উৎকৃষ্ট কার্য্যের "প্রস্তাব" করা, অপেক্ষাকৃত সহজ! আমরা কেবল তাহাতেই পণ্ডিত। বাল্য-বিবাহ ও বহু বিবাহ রহিত করা, ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীন চিন্তা করা, ইচ্ছানুরূপ ব্যবসায়ে বুদ্ধি চালনা করা ইত্যাদি বিষয়ে কাহার দ্বৈধ নাই; অন্যকে এই সকল কার্য্যে উপদেশ দান করিবার জন্য সভা, সমাজ, সম্বাদপত্র, গ্রন্থ প্রণয়নের ছড়াছড়ি হইতেছে। কিন্তু স্বয়ং কোন বিষয়ের প্রবর্ত্তক হইতে কাহারই সাহস হয় না। যিনি সভায় গিয়া তেজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা বাল্যবিবাহের প্রতিবাদ করিয়া আসেন, হয়ত তিনি আপনার দুই একটী বালিকা কন্যার বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছেন, কিম্বা তাহাদিগের বিবাহ-সম্বন্ধ দেখিতেছেন। যিনি অপরের বিধবা ভগ্নী বা কন্যার পুনরুপযমে সবিশেষ যত্নশীল, তিনি হয়ত, প্রাচীন গণের প্রশংসা প্রত্যাশায় বাড়ীর বিধবাদিগকে, একখানি পাইড়ওয়ালা কাপড় পরিতে দেখিলে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আমরা যে যে বিষয়ে দুই একটী উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম, দেশ-কাল-

অবস্থানুসারে ইহার মধ্যে অনেক তর্ক চলিতে পারে। ফলতঃ অধুনাতন ব্যক্তিগণের নৈতিক সাহসের অভাব প্রতিপন্ন করাই, আমাদের উদ্দেশ্য। বোধ হয়, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর জীবন-চরিত পাঠ, আমাদের উক্ত বিধ চিত্ত-রোগ প্রতিকারের একটী ঔষধ হইতে পারে। তিনি স্বয়ং সাধু কার্য্যের প্রদর্শক হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পত্নীরই গর্ভজাত সন্তান-গণ জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইত। মুকুটরাম রায়ই তাহার প্রমাণ। মুকুটের ন্যায় ক্ষমতাশালী তাঁহার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ভ্রাতারা জীবিত থাকিলে কি তাঁহাদের বিবাহ হইত না? অবশ্যই হইত! সেই সঙ্গে সঙ্গেই তিন শ্রেণী মিলিত হইয়া আসিত।

গোবিন্দের দুই পুত্র; রূপরাম ও মুকুটরাম। রূপরামের চারি পুত্র;—গোপাল রায়, চাঁদ রায়, বেণীরায় এবং কেশব রায়। বেণীরায়ের বংশে সূর্য্যকুমার রায় নামক একটী মাত্র পুরুষ অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনিও প্রাচীন, তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি কিছুই নাই। ইনিই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর শেষ বংশধর। গোবিন্দের পশ্চিম দেশস্থ কিঞ্চিৎ নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। রূপরামের পুত্রেরা বগীর "হাঙ্গামে" পূর্ব্বস্থলীর বাটী ত্যাগ করিয়া বাথর-

গঞ্জে গিয়া বাস করেন। বহুকাল পরে তাঁহার বংশীয়েরা পূর্ব্বস্থলীতে ফিরিয়া আসেন। তখন তত্রত্য গৃহাদি জঙ্গলাকীর্ণ ও বন্য পশুর আবাস হইয়াছিল। কালক্রমে ঐ সকল অট্টালিকা গঙ্গার উদরসাৎ হইয়াছে। সূর্য্যকুমার উহার ভগ্নাবশেষ দ্বারা গঙ্গাতীর হইতে একটু দূরে সামান্য বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। ঐ ভগ্নাবশেষ সকল অদ্যাপি, পূর্ব্বস্থলীর গঙ্গাতীরে দৃষ্ট হয়। স্ত্রী পুত্র বিহীন জরাজীর্ণ সূর্য্যকুমারে এবং ভাগীরথীর স্রোতঃ-ধৌত ভগ্নাবশেষে অদ্যাপি গোবিন্দের চিহ্ন রহিয়াছে। কিন্তু যায়—আর থাকে না।

দ্বারকানাথ ঠাকুর।

১২০১ সালে (১৭৯৪ খৃঃঅব্দে) ইঁহার জন্ম হয়। তিনি তাঁহার পিতৃব্য রামলোচনের পোষ্য পুত্র। পঞ্চারামের পুত্র জয়রাম নামক কোন ব্যক্তি ঠাকুর পরিবারের স্থাপন কর্ত্তা। জয়রাম ২৪ পরগণার আমিন ছিলেন। জিলার রাজস্ব আদায় করা তাঁহার কার্য্য ছিল। ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্টের "ফোর্টউইলিয়ম" নামক দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছিল। ঐ নির্ম্মাণ কার্য্যের ভার যে বিভাগে অর্পিত ছিল, জয়রাম কোন গতিকে তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ঐ বিভাগ বর্ত্তমান পবলিক্ ওয়ার্ক বিভাগের অনুরূপ। বর্ত্তমান পবলিক ওয়ার্কে কিরূপ কার্য্য হয় এবং অর্থের কিরূপ সদ্ব্যবহার হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাহা হউক, উক্ত দুর্গ নির্ম্মাণে প্রচুর অর্থ ও সময় লাগিয়াছিল। সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইতে সরদার মিস্ত্রী পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই রাশীকৃত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। যখন কার্য্যের উপযুক্তরূপ নিয়মাদি ছিল না, কর্ত্তৃপক্ষের তাদৃশ পর্য্যবেক্ষণ ছিল না, যে যত পারিত লুঠপাট করিত, তখন জয়রামও যদি অর্থোপার্জ্জনের প্রলোভন

পরিত্যাগে সমর্থ না হইয়া থাকেন তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। যে রূপেই হউক, তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতি ও পাঁচটী পুত্র রাখিয়া মরিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দর্প নারায়ণ ও নীলমণি নামক দুইটী পুত্র, দুইটী পৃথক্ পরিবার স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ দর্পনারায়ণ গৃহে থাকিয়া পৈতৃক বিষয়ের রক্ষা ও সমধিক উন্নতি করিয়াছিলেন। নীলমণি আপন ভাগ্য পরীক্ষার্থ বিদেশে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রথমে জিলা আদালতের কোন অধীন কর্ম্মচারীর পদ পান; কিন্তু অতি সত্বরই জিলার সেরেস্তাদারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। এই সেরেস্তাদারী পদ, তৎকালে অতিশয় দুর্লভ এবং বাঙ্গালীদিগের প্রাপ্য সর্ব্বপ্রধান পদের মধ্যে পরিগণিত ছিল। নীলমণি কলিকাতাস্থিত বাটীতে ভ্রাতার নিকট অর্থ পাঠাইতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে যখন তিনি একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিয়া গৃহে আসিলেন, তখন তাঁহার গৃহপ্রেরিত অর্থের হিসাবাদি লইয়া জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাদ হইতে লাগিল। পরিশেষে তাঁহার পৈতৃক ও স্বোপার্জ্জিত অর্থের অংশ স্বরূপ ভ্রাতার নিকট হইতে আপোষ মিমাংসায় এক লক্ষ টাকা পাইলেন। এই টাকা লইয়া তিনি পৈতৃক গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যোড়াসাঁকোয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে

লাগিলেন। এই নীলমণির তিন পুত্র, রামলোচন, রামমণি এবং রামবল্লভ। রামমণির দুই স্ত্রী, প্রথমার গর্ভে দ্বারকানাথ ও রাধানাথ এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে রমানাথের জন্ম হয়। রামলোচন নিঃসন্তান এই জন্য আপনার উত্তরাধিকারী রূপে দ্বারকানাথকে যথাশাস্ত্র পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ প্রথমে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। পরে চিৎপুর স্থিত সিরবোরন্ সাহাবের স্কুলে ইংরাজীর প্রথম শিক্ষা সম্পাদন করেন। এই স্কুলে অতি সামান্য সামান্য কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি স্কুলে যাহা শিখিয়াছিলেন তাহা যৎসামান্য। স্বাধীন চিন্তাশক্তি দ্বারা এবং মানবচরিত্র ও প্রকৃতি পুস্তক পর্য্যালোচনায় প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার বিদ্যালয়-শিক্ষায় যে ন্যূনতা ছিল, বড় বড় সাহেবদের সংসর্গ ও উপদেশে তাহার পূরণ করেন। এই সংসর্গে বালক কাল হইতেই তাঁহার মন উন্নত হইয়াছিল এবং এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের * সহিত পরিচয় হওয়াতে ধর্ম্ম ভাবেরও স্ফূর্ত্তি হয়। দ্বারকানাথ প্রথমে পিতামহের

* ইহাঁর জীবন-চরিত, প্রথম চরিতাষ্টকে লিখিত হইয়াছে।

ন্যায় বিলক্ষণ হিন্দু ছিলেন; হোম ও পূজায় তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের শিক্ষায়, হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতা ও আড়ম্বর বৃথা বলিয়া বুঝিলেন; এবং পরিশেষে সত্য ও আত্ম-ভাবে একেশ্বরের উপাসনা করিতে শিখিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় সদৃশ হিন্দু দার্শনিকের সহিত নিরন্তর অধ্যয়ন, ধর্ম্ম চিন্তা ও তর্কবিতর্ক করাতে এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাপনাদি ধর্ম্ম-কার্য্যে তাঁহার সহযোগিতা ও সহায়তা করাতে তাঁহার মন ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইল। তাঁহার মন এইরূপে উন্নত হওয়াতে তিনি সমস্ত জীবন কার্য্যে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, জাতিবিচার, ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রতিকূল হওয়া উচিত নহে। দ্বারকানাথ তাঁহার প্রাচীন শিক্ষক শিরবোরন্ সাহেবকে কখনই বিস্মৃত হন নাই। সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন, দ্বারকানাথ তাঁহাকে নিয়মিত রূপে বৃত্তি প্রদান করিতেন। দ্বারকানাথ নিজ যত্নে পারসী ও আরবী ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি আরবী ও পারসীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইয়াও ঐ দুই ভাষায় সুচারুরূপে লিখিতে ও কহিতে পারিতেন।

দ্বারকানাথের পালক পিতা যদিও অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী জমিদার ছিলেন না, তথাপি দ্বারকানাথের চাল

চলন বড় মানবী ধরণের ছিল। দ্বারকানাথ যে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন, তাহা তৎকালীন হিন্দু পরিবারে অভাবপূরণে সমর্থ হইত; কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর সদৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহা সামান্য ছিল। সুতরাং তাঁহাকে নিজ যত্নে ও পরিশ্রমে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইয়াছিল। একজন লেখক বলিয়া গিয়াছেন যে, দারিদ্র্য ও অপরিমিত সম্পদশালিতার মধ্যবর্ত্তী অবস্থাতেই সুন্দররূপে মানসিক উন্নতি হইয়া থাকে। দ্বারকানাথ ইহার স্পষ্ট নিদর্শন।

বালক কালেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং পৈতৃক বিষয়াদির ভার, তাঁহার উপরেই পতিত হইল। যে সকল জমিদারীর ভার তাঁহার গ্রহণ করিতে হয়, তন্মধ্যে পাবনার অন্তর্গত বহরমপুর নামক একটী জমিদারী ছিল। এই ভার গ্রহণে তাঁহার একটী বিশেষ উপকার এই হইল যে, অচির কাল মধ্যে তিনি জমিদারী কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ হইয়া উঠিলেন। এই দক্ষতা উত্তর কালে তাঁহার অনেক কাজে লাগিয়াছিল। যেহেতু দেশের ব্যবহারিক ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় অবস্থা ঐ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছিল। জমিদারী ও রাজস্ব পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তাঁহার আইন শিক্ষার অভিলাষ হয়। আইন শিক্ষা বিষয়ে কট্‌লার ফরগুসন্ সাহেবের দ্বারা অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই সাহেব সেই

সময়ের এক জন প্রধান ব্যারিষ্টার ছিলেন। প্রথমাবস্থায় দ্বারকানাথের বুদ্ধির উন্নতি সাধন বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় এবং ব্যবস্থাধ্যাপন বিষয়ে উপরি উক্ত সাহেবই প্রধান ছিলেন। তিনি যে কেবল দেওয়ানী আইনের মূল সূত্রগুলি শিখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে; আইন ব্যবসায়ীকে যেমন রীতিমত শিখিতে হয়, সর্ব্বপ্রকার আইন, তিনিও সেইরূপে শিখিয়াছিলেন। এইরূপে ব্যবস্থাজ্ঞ হইয়া ওকালতী আরম্ভ করিলেন। তৎকালীন অনেক গুরুতর মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি, তাঁহার হাত দিয়া হইয়াছিল।

তিনি ওকালতী করিতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় রাজা ও জমিদারের বিশ্বাস ভাজন হইয়াছিলেন। কতকগুলি শত্রু-হস্ত-গত বিষয় বাঁচাইয়া দেওয়াতে তাঁহার ওকালতী কার্য্যের অত্যন্ত গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রধান উকিল বলিয়া দেশ বিদেশে তাঁহার সুখ্যাতি হইল। বঙ্গদেশের এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারিগণের বিশ্বাস্য উপদেশক ও ব্যবস্থা প্রতিনিধি হইলেন। বঙ্গদেশে রাণী কাত্যায়নী, রাজা বরদাকান্ত রায় প্রভৃতি তাঁহার মক্কেল ছিলেন। যে সময়ে দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে কিছুমাত্র ঐক্য ছিল না; সদ্বিচার প্রাপ্তি স্মরতি খেলার মত ছিল; রাজনীতি, কোন প্রজাবর্গের

অভাব ও ইচ্ছা বাড়াইতেছিল; ঐ সময়ে ওকালতী কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয়।

উপরি উক্ত কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরাজ বণিকগণের কলিকাতাস্থ বাণিজ্য প্রতিনিধি হইলেন। নীল, রেশম প্রভৃতি এদেশীয় বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া ইয়ুরোপে পাঠাইবার জন্য জাহাজ বোঝাই করিয়া দিতেন। কেবল রাইয়তগণের নিকট হইতে খাজানা আদায় করা এবং বৃথা কার্য্যে সময় ক্ষেপণ করাই যে, জমিদারের কার্য্য নহে, দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বসমকালীন অকর্ম্মণ্য জমিদারদিগকে তাহার শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি কি দেশীয় কি বিদেশীয় উভয় জাতির মধ্যেই আপনার পদ স্থাপন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ২৪ পরগণার নিমকি কালেক্টরের আফিসে সেরেস্তাদারের পদ খালি হয়। দ্বারকানাথ ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন। অতিশয় সুখ্যাতির সহিত কাজ করিতে লাগিলেন। এই কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে সদর বোর্ডের দেওয়ান হইলেন। বহুবৎসর অত্যন্ত কার্য্য-দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত ঐ কার্য্য করিয়া নিজের কার্য্য বাহুল্য প্রযুক্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ পদ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার এস্তোফা পাইয়া বোর্ডের সেকরেটারি পারকার সাহেব যার পর নাই

দুঃখিত হন এবং যথেষ্ট সুখ্যাতি ও তাঁহার কার্য্য-নৈপুণ্যের বিচার করিয়া তাঁহাকে দুইখানি পত্র লেখেন। ঐ পত্র দুই খানি এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারিত; কিন্তু সংক্ষিপ্ততা এই গ্রন্থের একটী উদ্দেশ্য বলিয়া তাহা হইল না। বোর্ডের কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনি ইউরোপীয় প্রণালীতে কারবার আরম্ভ করিলেন। সব প্রথমে দ্বারকানাথ ঠাকুর এদেশে ইউরোপীয় প্রণালীর বাণিজ্যালয় স্থাপন করিলেন বলিয়া তৎকালের গবর্ণর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক্ বাহাদুর তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। যেহেতু তৎকালে কেহই এরূপ স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সাহসী হন নাই। সকলেই বিলাতী কুঠির মুচ্ছুদ্দিগিরি করিয়া এবং দস্তুরির লাভে সন্তুষ্ট হইয়া কালযাপন করিতেন। সুতরাং এতাদৃশ সময়ে এরূপ অগ্রসরতা দর্শনে গবর্ণর বাহাদুর সন্তুষ্ট হইয়া পত্র দ্বারা দ্বারকানাথকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ইহা একজন বাঙ্গালীর পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহার পর আর কয়েক জন বড় বড় সাহেব ও বাঙ্গালীর সহিত মিলিত হইয়া একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন। ক্রমে নীল, রেশম ও চিনির কুঠী করিয়াছিলেন। রাণীগঞ্জে কয়লার কাজ চালা-

তেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ওকালতী, স্বাধীন বাণিজ্য, কুঠির কাজ প্রভৃতিতে যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, জমিদারী কার্য্যেও সেইরূপ কৃতকার্য্য হয়েন। পৈত্রিক জমিদারী ব্যতীত তিনি নিজে অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজসাহীর অন্তর্গত কালীগ্রাম, পাবনার অন্তর্গত সাহাজাদপুর, রংপুরের মধ্যে স্বরূপপুর, মণ্ডলঘাটের তের আনা অংশ, দ্বারবাসিনী, জগদীশপুর, যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদসাহী প্রভৃতি প্রধান। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক জমীদারী তিনি স্বয়ং ক্রয় করেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার পৈত্রিক জমিদারী পাবনার অন্তর্গত বহরমপুর, তাঁহার পক্ষে বড় বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। তত্রত্য প্রজারা ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক খাজনা দেওয়া রহিত করে এবং নায়েব গোমস্তার পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রার্থনায় মাজিষ্টরের কাছে দরখাস্ত দেয়। মাজিষ্টর স্বয়ং তত্ত্বানুসন্ধান করিবার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং প্রজাগণকে জমিদারের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার আশা দিলেন। প্রজারা মাজিষ্টরের প্রশ্রয়ে আরও উদ্ধত হইয়া উঠিল। দ্বারকানাথ এই সম্বাদ পাইয়া মাজিষ্টরকে শিক্ষা দিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মাজিষ্টরের কতকগুলি পূর্ব্বকৃত

অপরাধ সন্ধান করিয়া তিনি নিজে বহরমপুরে গমন করিলেন এবং একদিন রাত্রে সাহেবের তাম্বুতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। প্রথমে সাহেবকে কহিলেন যে, একপক্ষের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করা তাঁহার অন্যায় হইতেছে এবং প্রজারা যে সকল অত্যাচারের কথা সাহেবকে জানাইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মচারিগণের দ্বারা সেরূপ অত্যাচার হয় না। অতএব সাহেব প্রজাদিগের পক্ষতা পরিত্যাগ করুন। সাহেব এ কথায় সম্মত না হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন দ্বারকানাথ, সাহেবকে পূর্ব্বাপরাধ গুলি স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে পুলিসে অর্পণ করিবার ভয় প্রদর্শন করিলেন। সাহেব তখন সুপথে আসিয়া সকল গোল মিটাইয়া দিলেন। একে সাহেব, তাহে জিলার হর্ত্তাকর্ত্তা, তাঁহার সঙ্গে এমন অসম সাহসের কার্য্য, বোধ হয়, দ্বারকানাথের পূর্ব্বে বা পরে কোন বাঙ্গালীই করিতে পারেন নাই।

দ্বারকানাথ আপনার স্বার্থ রক্ষার্থ যেমন উদ্যোগী ও তৎপর ছিলেন, পরার্থ রক্ষা ও পরের অভাব দর্শনেও ঠিক সেইরূপ ছিলেন। ইহার একটি উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া গেল। আর একটী নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

কোন সময়ে একজন জিলার জজ্ পীড়িত হইয়া বিলাত গমনার্থ বিদায় লইয়াছিলেন। তাঁহার এক-লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। ঋণ পরিশোধের কোন উপায় ছিল না। তিনি স্বদেশে যাইবার উদ্যোগ করিতে-ছেন শুনিয়া উত্তমর্ণেরা তাঁহাকে কারাগারে দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাহেব এই বিপদের সম্বাদ পাইয়া চিন্তা সাগরে মগ্ন হইলেন এবং তাদৃশ অসুস্থাবস্থায় কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যু হইবে, এইরূপ স্থির করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সাহেবের দ্বারকানাথ ঠাকুরকে মনে পড়িল। কারণ তৎকালে বড় বড় সাহেবেরা দ্বারকা-নাথ ঠাকুরকেই উদার ও বদান্য বলিয়া জানিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত সাহেবের কোন কালে চাক্ষুস পরিচয় ছিল না। জজ আপনার বিপদ বিজ্ঞাপন করিয়া দ্বারকানাথকে পত্র লিখিলেন। দ্বারকানাথ অবিলম্বে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সাহেবের উত্ত-মর্ণগণকে একলক্ষ টাকা দিলেন। তাহাদিগের নিকট সাহেবের যে সকল খৎ ও রসিদ্ ছিল তাহা গ্রহণ করিলেন। এই সকল কাগজের সহিত দ্বারকানাথ জজের নিকট গমন করিলেন এবং আপনি আপনার পরিচয় দিলেন। সাহেব মহাসন্তুষ্ট হইয়া আপনার বিপদের কথা সবিস্তরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সাহেবের কথা শেষ না হইতেই উল্লিখিত খৎ ও রসিদ সকল তাঁহার সম্মুখে অর্পণ করিলেন। সাহেব তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে দ্বারকানাথের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন। পরিশেষে জজ্ দ্বারকানাথকে ঐ টাকার জন্য একখানি খত লিখিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথ এই বলিয়া তাহা লইতে অস্বীকার করিলেন যে, সাহেব উপস্থিত পীড়া হইতে অব্যাহতি না পাইলে খৎ লওয়া বৃথা; পক্ষান্তরে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইলে অবশ্যই টাকা দিবেন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সাহেব সুস্থ হইয়া এদেশে আসিয়া দ্বারকানাথের ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন।

এইরূপ দয়া ও বদান্যতার কার্য্য তাঁহার অনেক ছিল। সময়ে সময়ে নগদ টাকা দিয়া অনেকের সাহায্য করিতেন। অনুরোধ পত্র দ্বারা সওদাগরি আফিসে ও গবর্ণমেণ্ট আফিসে অনেক বাঙ্গালী ও সাহেবের চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। কোন সময়ে তাঁহার একজন সহাধ্যায়ী দুরবস্থায় পড়িয়া সাহায্য প্রার্থনায় তাঁহাকে একপত্র লেখেন। দ্বারকানাথ পত্র পাইবামাত্র এক কালে তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দেন এবং তাঁহাকে এই সঙ্গে পত্র লিখিলেন যে, তিনি কলি-

কাতা আইলে, চিরকালের জন্য তাঁহার ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিবেন।

উপরি উক্ত জজ্ সাহেবকে এককালে লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। দিবার সময়ে, টাকা পুনঃপ্রাপ্ত না হইবারই সম্ভাবনা ছিল। এমন স্থলে, তাহার সহিত তুলনা করিলে সহাধ্যায়ীকে পাঁচশত টাকা দান করা সামান্য কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত কার্য্য দ্বারা তাঁহার চরিত্রের প্রকৃতভাব অবগত হওয়া যাইতেছে। দ্বারকানাথ স্বার্থ ও পরার্থ সমদৃষ্টিতে দেখিতেন। লোক চরিত্রের মন্দাংশ গ্রহণ করাই, লোকের প্রকৃতি। এইজন্য অবিশেষজ্ঞ লোকের মধ্যে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে একটী কুসংস্কার আছে। ঐ সকল লোকে তাঁহাকে স্বার্থ ও বঞ্চনা পরায়ণ বলিয়া জানেন। তাঁহারা এমন মনে করিতে পারেন যে, বিপন্ন জজকে লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করায় হয়ত দ্বারকানাথের কোনরূপ স্বার্থ সাধনের অভিসন্ধি ছিল। কিন্তু একজন সহাধ্যায়ী সামান্য বাঙ্গালীকে এককালে পাঁচশত টাকা দিয়া সাহায্য করায় সেরূপ অভিসন্ধির সম্ভাবনা ছিল না। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি, এ কার্য্যটিতে তাঁহার অন্তরের প্রকৃত ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃত সত্য কোনরূপেই আচ্ছন্ন থাকে না। তাঁহার এতাদৃশ অনেক কার্য্য লক্ষিত হইবে।

দ্বারকানাথের পূর্ব্বতন প্রভু ও পরম বন্ধু প্লাউডেন্ সাহেব, দ্বারকানাথের অনুরোধে, ২৪ পরগণার কালেকটারের কাছারীতে অনেক লোকের কর্ম্ম করিয়া দেন। সাহেব তখন ২৪ পরগণার কালেক্টার ছিলেন। কোন সময়ে ঐ সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন কতকগুলি টাকা চুরি করে। গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য প্লাউডেন্ সাহেবকে ঐ ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ করেন। দ্বারকানাথ ইহা জানিতে পারিয়া সাহেবকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, "আমি ঐ ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য, যেহেতু আমার অনুরোধেই ঐ ব্যক্তিকে কর্ম্ম দেওয়া হইয়াছিল।" প্লাউডেন্ সাহেব যার পর নাই সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ঐ পত্রের উত্তর দেন।

দ্বারকানাথ ২৪ পরগণার দাতব্য চিকিৎসালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। নিরাশ্রয় অন্ধগণের সাহায্য নিমিত্ত ঐ টাকায় একটী ফণ্ড হইয়াছিল। ঐ ফণ্ডের জন্য কয়েক জন প্রধান সাহেব ট্রষ্টি নিযুক্ত হন। ট্রষ্টিগণের অন্যতম পার্কার সাহেব দ্বারকানাথকে এক পত্র লেখেন। ঐ পত্রের একাংশে এইরূপ লেখা আছে। "আমি বহুকাল হইতে আপনার অন্তরের পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা এবং অতুল্য দয়ার বিষয় এত অধিক পরিমাণে অবগত আছি যে. আপনার এই অসামান্য দান দেখিয়া, অন্যে বিস্মিত হইতে পারে;

কিন্তু, আমি বিস্মিত হইলাম না।” তাঁহার সময়ে কি শিক্ষা সম্বন্ধে কি অন্যবিধ দয়ার কার্য্যে যেখানে যে কোন ঘটনা উপস্থিত হইত, তিনি সর্ব্বত্রই অজস্র দান করিতেন। যাবতীয় সাধারণ কার্য্যের চাঁদার পুস্তকে তাঁহার নাম লিখিত হইত। সৎকার্য্যে দান করিবার জন্য তাঁহার মুদ্রাধার সর্ব্বদা মুক্ত থাকিত।

এদেশীয়দিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের যে শিক্ষা-সভা ছিল, দ্বারকানাথ তাহার একজন সুযোগ্য এবং পরমোদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি হিন্দু কালেজকে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির দ্বার মনে করিতেন। এই জন্য তাহার উন্নতি ও স্থায়িত্ব পক্ষে সবিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ১২৪৩ সালে কলিকাতার মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হয়। তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া উহার ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তিন বৎসর অন্তর দুই হাজার টাকা পারিতোষিক দিতেন। তিনি এই দান করিবার সময় কালেজের অধ্যক্ষগণকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার যে সকল স্বদেশীয় ছাত্র কালেজে অধ্যয়ন করে, কেবল মাত্র তাহাদিগেরই উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ঐ টাকা ব্যয় করা হইবে। মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হইবার সময়ে শারীর-বিজ্ঞান শিক্ষার একটী বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছিল। শবব্যবচ্ছেদে

হিন্দু ছাত্রগণ আপত্তি উপস্থিত করেন। দ্বারকানাথ ইহা জানিতে পারিয়া কালেজের ব্যবচ্ছেদ গৃহে প্রতি-দিন স্বয়ং উপস্থিত হইতেন এবং ছাত্রগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেন যে, ইহাতে তাঁহাদের জাতিপাত বা অধর্ম্ম হইবে না, বরং তদ্দ্বারা শারীর-বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট চিকিৎসক হইবেন। তিনি কিছুকাল এইরূপ চেষ্টা করায়, হিন্দু ছাত্রগণের কুসংস্কার ও অমূলক আপত্তি অন্তরিত হইল।

আমরা প্রথম চরিতাষ্টকে রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতে সতীদাহ ও তন্নিবারণ বিষয়ক বিবরণ সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়াছি। এস্থলে কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, দ্বারকানাথ ঠাকুরও ঐ বিষয়ে এক জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তজ্জন্য লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্ বাহাদুরের স্ত্রী লেডি বেণ্টিঙ্ক্ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লেখেন।

এদেশীয় জমিদারগণের কিরূপ ক্ষমতা, উত্তমরূপে সেই ক্ষমতার পরিচালন করিতে পারিলে দেশের কিরূপ উন্নতি হইতে পারে এবং তাহা গবর্ণমেণ্টের সুশাসন পক্ষে কতদূর পোষকতা করিতে পারে, দ্বারকানাথই প্রথমে তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি গবর্ণমেণ্ট ও জমিদারের মধ্যে "জমিদারের সভা" নাম দিয়া একটী সভা স্থাপন করেন। ১২৪৫ সালে

স্থাপিত হয়। এই সভার দ্বারা উভয়ের পত্রাদি সম্বন্ধ হইত। এই সভা স্থাপন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করা হয়। গবর্ণমেণ্ট সে আবেদন গ্রাহ্য করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ঐ সভার সভাপতি ও তৎকালীন "ইংলিসম্যান্" সম্পাদক হ্যারি সাহেব এবং বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এই দুই ব্যক্তি উহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথই ইহার জীবন স্বরূপ ছিলেন। ঐ সভার নাম এক্ষণে "ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান্ এছোছিয়েসন্" হইয়াছে এবং উহার ক্ষমতাও, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত দেখা যাইতেছে। উহার দ্বারা দেশের যে কিছু হিত সাধিত হইতেছে, দ্বারকানাথই তাহার মূল।

লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্ বাহাদুরের রাজ্যশাসনে এদেশীয় প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এইজন্য দ্বারকানাথ সংস্কৃত কালেজ গৃহে তৎকালীন প্রধান প্রধান দেশীয় ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া বেণ্টিঙ্ক্ বাহাদুরকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। সেই অভিনন্দন পত্রিকার প্রত্যুত্তরে গবর্ণর বাহাদুর যে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ "ভারতবর্ষে ইংরাজরাজশাসনের ফলাফল কেবল একমাত্র তুমিই বিশেষ রূপে বিচার করিতেছ।"

১২৪২ সালে দ্বারকানাথ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণে

যাত্রা করেন। তখন রেলওয়ে হয় নাই। তিনি ডাকের গাড়ীতে তদ্দেশীয় যাবতীয় প্রধান প্রধান নগর, দেবায়তন ও তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তত্রত্য উচ্চশ্রেণীস্থ চৌবে উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণকে ভোজ দিয়া ছিলেন। তিনি যখন আগরার দুর্গ দর্শনে যান, তখন কতকগুলি খৃষ্টীয়ান্ সৈনিক তাঁহাকে আপনাদের উপাসনা গৃহের দুরবস্থা দেখাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। দ্বারকানাথ সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে পাঁচশত টাকা দান করেন।

বিলাতের সহিত ভারতবর্ষের সংস্রব, এদেশের জ্ঞান, সভ্যতা ও উন্নতি পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। বাষ্পীয় পোতই ঐ সংস্রব বন্ধনের প্রধান হেতু। যেমন স্থলপথে রেলওয়ে কোম্পানি, তেমনি সমুদ্র পথে কলের জাহাজ চালাইবার কোম্পানি আছে। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে ঐ কোম্পানির কার্য্য আরম্ভ করাইবার জন্য দ্বারকানাথ সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি দূরদর্শনের দ্বারা বুঝিয়া ছিলেন যে, এই সম্বন্ধে এদেশের বিশেষ উন্নতি হইবে। দ্বারকানাথ, ইংরাজী, বাঙ্গলা ও দ্বিভাষী সম্বাদ পত্র সকলের বিশেষ উৎসাহ দাতা ছিলেন। কারণ তাঁহার বিশেষ ধারণা ছিল যে, সম্বাদ পত্রই, দেশের উন্নতি

সাধনের প্রধান যন্ত্র। এইজন্য তৎকালীন প্রধান প্রধান ইংরাজী সম্বাদ পত্রের উন্নতি সাধন বিষয়ে তিনি প্রধান সহায় ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "প্রভাকরকে" তিনি ভাল বাসিতেন; টাকা দিয়া সাহায্য করিতেন এবং কাগজে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল প্রকাশ করিবার জন্য সম্পাদককে পরামর্শ দিতেন। শত্রুকে কিরূপে নিরস্ত্র করিতে হয়, অন্যাপেক্ষা দ্বারকানাথ তাহা উত্তমরূপে বুঝিতেন। তাঁহার সময়ে "জ্ঞানান্বেষণ" নামক এক-খানি সম্বাদপত্র প্রচারিত হইত; হেয়ারস্কুলের প্রধান শিক্ষক রসিককৃষ্ণ মল্লিক তাহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি একদা, আপনার কাগজে দ্বারকানাথের নিন্দা প্রচার করেন। এই অপরাধে, সম্পাদককে প্রহার করিবার জন্য দ্বারকানাথ অনেক বন্ধুর কাছে পরামর্শ পাইয়া ছিলেন; কিন্তু দ্বারকানাথ এই সকল পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া রসিক বাবুকে ভোজে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাকে নম্রভাবে বুঝাইয়া দেন যে, সম্পাদক তাঁহার নিন্দা প্রচার বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তদবধি দ্বারকানাথের চরিত্র বিষয়ে, সম্পাদকের মত ফিরিয়া যায়।

ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়াও একটি উৎকৃষ্ট সৌভাগ্য ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাহা সভ্যতম ইয়ুরোপ খণ্ডের অনেক লোকে অদ্যাপি প্রাপ্ত হন নাই। তাহার

নাম মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। পূর্ব্বে ইহা এদেশে ছিল না ; পত্রিকা সম্পাদকেরা রাজকার্য্যের ফলাফল স্বাধীন ভাবে বিচার করিতে পারিতেন না। ১২৪৫ সালে সর্ চার্‌লস্ মেট্‌কাফ্ বাহাদুর ঐ স্বাধীনতা প্রদান করেন। ঐ স্বাধীনতা প্রাপ্তি বিষয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর কত যত্ন, কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম ও কত উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তরে লিখিবার অবসর নাই। নিম্নে তৎকালীন এক খানি পত্র এবং পার্কার সাহেবের বক্তৃতার মর্ম্ম সঙ্কলন করিলাম; বোধ হয়, পাঠক, তদ্দ্বারাই তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন। এদেশের হিতৈষী প্রধান প্রধান ইংরাজ ও বাঙ্গালী, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান নিবন্ধন গবর্ণর বাহাদুরকে অভিনন্দন দিবার মানসে একত্র সমবেত হন। দ্বারকানাথ ঐ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সভাপতিকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন ; "দেশীয় জমিদার ভাবেই হউক, বণিক ভাবেই হউক, কিম্বা অন্যাপেক্ষা আমি গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ পরিচিত এই জন্যই হউক, এতাদৃশ মহৎ বিষয় উপলক্ষে কিছু বলা, কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট যত প্রকার হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যন্ত্রের স্বাধীনতা দান তন্মধ্যে প্রধান। যেহেতু এই স্বাধীনতা, ভারতরাজ্য শাসন বিষয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য করিবে। এই

স্বাধীনতা দ্বারা, শাসন-কর্ত্তৃগণের ন্যায়পরতায়, ভারত-বাসিগণের সহজেই বিশ্বাস হইবে, কারণ ইহা দ্বারা প্রজাগণকে রাজকার্য্যের ফলাফল বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে।” ঐ সভায়, সহকারী সভপতি পার্কার সাহেব দ্বারকানাথকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বক্তৃতা করেন ; “আমি যে ব্যক্তির সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তিনি এ দেশের মধ্যে প্রধান ; তাঁহার দ্বারা রক্ষিত বা তাঁহার সৎপরামর্শ ও বদান্যতার ফলভোগী শত শত ব্যক্তি তাঁহাকে সতত স্মরণ করে ; যাহারা তাঁহার দয়া ও দাতৃত্বের ফল ভোগ করিয়াছে, তাদৃশ সহস্র সহস্র ব্যক্তির চিত্ত-ক্ষেত্রে তাঁহার নাম অঙ্কিত আছে ; কি বিদ্যালয়ে, কি চিকিৎসালয়ে, কি বিজ্ঞান ও সাহিত্য সমাজে যাঁহার নাম অহোরহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আমার যতদূর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাহাতে দয়া, দাক্ষিণ্য ও ঔদার্য্য বিষয়ে তাঁহার উপমা দিতে পারি না। আমরা আজ যে বিষয়ের জন্য সমাগত হইয়াছি, তাহার সহিত যে ব্যক্তির নাম অনপনেয়রূপে সম্বন্ধ আমি আমার পরম বন্ধু সেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম সকলের সমক্ষে গ্রহণ করিতেছি।—”

কলিকাতায় পটোলডাঙ্গাস্থিত “কিবার হস্‌পিটাল” স্থাপন সময়ে যে কমিটি নিযুক্ত হয়, দ্বারকানাথ সেই কমিটির এক জন প্রধান সভ্য ছিলেন। তিনি অন্তরের সহিত

ঐ কমিটির কার্য্য করিয়াছিলেন। মৃত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ঐ কার্য্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বাবু মতিলাল শীল ভূমি দান করেন। দ্বারকানাথ দেশীয়গণের মধ্যে যেরূপ সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সাহেবদিগের মধ্যেও সেইরূপ। বড় বড় সাহেবের চরিত্র শোধনের জন্য তাঁহাদের সমক্ষে দোষের কথার উল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন। লর্ড অক্লণ্ড বাহাদুর এদেশের হিতানুষ্ঠান সম্বন্ধে সর্ব্বদা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। জমিদারের সহিত গবর্ণমেণ্টের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় প্রস্তাব লইয়া সর্ব্বদাই কথোপকথন হইত। প্রতি বৃহস্পতিবারে দ্বারকানাথের সহিত লর্ড বাহাদুরের সাক্ষাৎ হইত। বারাকপুরে, দ্বারকানাথকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার সকলই অদ্ভুত! বাবুগিরি, সাহেবি চাল চলনেরও চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন। বেলগাছিয়ায় একটী উদ্যান করিয়াছিলেন। তেমন উদ্যান এ দেশের কোন বড়মানুষের ছিল না। উহা এ দেশের যাবতীয় জ্ঞানী, ধনী, ধার্ম্মিক ও রাজনীতিজ্ঞের আরামস্থল ছিল। গবর্ণর জেনেরল পর্য্যন্ত ঐ বাগানে নিমন্ত্রণে যাইতেন।

অতঃপর দ্বারকানাথ ঠাকুর ১২৪৮ সালে ইউরোপ

যাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার ঐ অভিপ্রায়, পরবৎসর জানুয়ারি মাসে কার্য্যে পরিণত হয়। বিলাত যাত্রা কালে, তিনি এ দেশের অনেক প্রধান প্রধান কমিটি হইতে অনেক অভিনন্দন পত্র পাইয়াছিলেন এবং সেই সকল পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি ১২৪৯ সালে (১৮৪২ খৃঃ অব্দের ৯ই জানুয়ারি) "ইণ্ডিয়া" নামক পোতারোহণে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায় এবং অন্যান্য ইউরোপীয় বন্ধুগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁহার বিলাত যাত্রার এক খানি দৈনিক বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে, কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন, কোথায় কি করিয়াছিলেন, সমুদায় চিত্রিত করা আছে। কলিকাতা হইতে লণ্ডন্ যাইবার পথে যে খানে যে কিছু দর্শনীয় আছে, দ্বারকানাথ তাহার সকলই দেখিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান স্থানে দুই এক দিন ছিলেন;—সর্ব্বত্রই রাজার হালে ছিলেন। তিনি, লণ্ডনে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই চিস্উইকে একটী বাগান দেখিতে যান, ঐ বাগানে তিনি মনোহর পরিচ্ছদধারী আঠার শত ব্যক্তিকে এক কালে দেখিতে পান। তাঁহার নিকট যে পরিচয়-পত্রিকা ছিল, তৎপ্রদর্শনে বিলাতের প্রধান প্রধান লোকদিগের দ্বারা

মহাসমাদরে পরিগৃহীত হন। রাজমন্ত্রী সর্ রবর্ট পিল্, বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলের সভাপতি লর্ড ফিট্জারলণ্ড, লর্ড ব্রাইহেম প্রভৃতি মহামান্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ করস্পর্শ করিয়া অন্তরের সহিত তাঁহার সমাদর করেন।

২২শে জুন তারিখে কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টারের মেম্বরেরা লণ্ডনের কোন প্রসিদ্ধ স্থানে একটী সভা করিয়া দ্বারকানাথের অভ্যর্থনা করেন। ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তারা এই রূপে এক জন বাঙ্গালী প্রজার সম্মান করিয়াছিলেন, ইহা অবগত হওয়া বঙ্গবাসিগণের বিশেষ আনন্দের বিষয়। তিনি ক্রমশঃ মহারাণী, রাজপরিবারস্থ সমস্ত লোক এবং ইংলণ্ডের যাবতীয় প্রধান প্রধান লোকের নিকট বিশেষ সম্মানের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি লণ্ডন হইতে তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পত্র লিখেন। ঐ পত্র হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। "আমি আসিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের অনেক বস্তু দেখিয়া এরূপ প্রত্যাশা করি নাই যে, ইংলণ্ড সদৃশ ক্ষুদ্র দ্বীপে আর কিছু নুতন দেখিব। লণ্ডন বাস্তবিকই বিস্ময়কর রাজধানী। লণ্ডনস্থ ব্যক্তিগণের কার্য্যপরতা, জনতা, গাড়ী, ঘোড়া, দোকান ইত্যাদিতে আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে রজনী ১২টা পর্য্যন্ত আমি কেবল লোকজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে ব্যস্ত থাকি।

লণ্ডনে পৌঁছিবার দুইদিন পরেই মহারাণী কর্ত্তৃক মহা সমাদরে পরিগৃহীত হইয়াছি। যাহার ধন আছে, সে লণ্ডনে আসিয়া জীবনের সুখসম্ভোগ করুক। আমি এখানকার কতকগুলি বড় লোকের উদ্যান পরিদর্শন করিয়াছি, তাহার ফল এই হইয়াছে যে, আমার বেল্‌-গাছিয়ার বাগানের প্রতি আর কিছুমাত্র আস্থা নাই। আমি লণ্ডনের বিষয় আজ কিছুই লিখিতে পারিলাম না; পরপত্রে কিছু কিছু লিখিবার চেষ্টা করিব।”

এক দিন মহারাণী ভিক্টোরিয়া, তাঁহার স্বামী, খুল্ল-তাত প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত, অশ্বারোহী সৈন্যগণের রণাভিনয় পরিদর্শন করিতেছিলেন। মহা-রাণী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া দ্বারকানাথ তদ্দর্শনে গমন করেন এবং মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে সেই রণকৌশল বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আর এক দিন মহারাণী দ্বারকা-নাথকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঐ ভোজে মহারাণী স্বয়ং, তাঁহার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট এবং রাজপরিবারস্থ অন্যান্য অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। মহারাণী ঐ স্থানে দ্বারকানাথকে সেই দিনে মুদ্রিত তিনটী স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর সদৃশ সুসামাজিক লোক প্রায় দেখা যায় না। সমাজের সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের সহিত মিশিতে এবং তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে, তাঁহার বিলক্ষণ

ক্ষমতা ছিল। ইংলণ্ডের বড় বড় লোকের সহিত কিরূপ মিশিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহার কতকগুলি নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে আর একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। মহারাণী এক দিন নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে আপন অন্তঃপুরে লইয়া যান এবং জ্যেষ্ঠপুত্র ও পুত্রবধূর নিকট দ্বারকানাথের পরিচয় দিয়া দেন। কেবলমাত্র পরিচয় নহে, তাঁহারা দ্বারকানাথের করস্পর্শ করিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড, সদ্গুণের ও স্বদেশহিতৈষীর কতদূর সমাদর করেন, এই রাজব্যবহার দ্বারা এস্থলে তাহারও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ইহার পর দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিলাতের ছাপাখানা, পোষ্ট আফিস, পশুশালা, দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রভৃতি দর্শন করেন। তন্মধ্যে কয়েকটী কথামাত্র, এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইবার যোগ্য। তিনি টাইম্‌স নামক সম্বাদ পত্রের যন্ত্রালয়ে গিয়া দেখিলেন, দুই ঘণ্টায় ২০,০০০ হাজার কাগজ মুদ্রিত হইতেছে। পোষ্ট আফিসে গিয়া দেখিলেন, পত্রে ও সম্বাদপত্রে দুই লক্ষ, দুই ঘণ্টায় মধ্যে নির্ব্বাচিত ও যথাস্থানে প্রেরিত হইতেছে। কোন সময়ে তত্রত্য পশুশালায় গিয়া দেখিয়াছিলেন, সেখানকার যাবতীয় পশুই, প্রায় ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পূর্ব্ব দেশ হইতে সংগৃহীত হই-

য়াছে। ঐ পশুগণের রক্ষাপ্রণালী দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং এই প্রণালী, ভারতবর্ষীয় পশুশালাধ্যক্ষগণের অনুকরণীয় বলিয়া বোধ করিয়া ছিলেন। ইংলণ্ডের সকলই অদ্ভুত!

দ্বারকানাথের পরম বন্ধু ও উপদেষ্টা রাজা রামমোহন রায় বিলাতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ব্রিষ্টলের নিকটে তাঁহার শব সমাহিত হয়, ইহা প্রথম চরিতাষ্টকে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বারকানাথ সেই সমাধি দর্শনার্থ ব্রিষ্টলে গিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি ফরাসী দেশ দর্শনার্থ যাত্রা করেন। যাত্রাকালে ইংলণ্ডস্থ সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার গমনে দুঃখ প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনেরল্ মধ্যে মধ্যে এ দেশের রাজা ও বড় বড় জমিদারগণকে দর্শন দেন। উহাকে "লেভি" বলে। দ্বারকানাথের বিদায় কালে, ঐ "লেভির" মত সমারোহ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ন্যায় পারিসেও যথাযোগ্য সমাদরে পরিগৃহীত হন। রাজা, রাণী, রাজমন্ত্রী প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ, এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রধান প্রধান লোকের নিকটই তিনি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপেই, মহতের পুরস্কার হইয়া থাকে। তিনি জগদ্বিখ্যাত পারিস নগরীতে প্রবেশ করিয়াই তাহার মনোহারিণী

শোভায় মোহিত হইয়াছিলেন। কোন বিশেষ রাজকীয় উৎসবের সময় নগরকে আলোকমালায় মণ্ডিত করার প্রথা আছে। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, (১৮৬৯ খৃঃ অব্দে) ১২৭৬ সালে মহারাণীর মধ্যম পুত্র ডিউক অফ্ এডিন্‌বরা এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ এদেশে আগমন করিলে কলিকাতা রাজধানীতে কিরূপ আলোকোৎসব হইয়াছিল। পারিসে প্রবেশ করিয়াই দ্বারকানাথের বোধ হইয়াছিল, কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে পারিসে বুঝি ঐরূপ আলোকোৎসব হইতেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, পারিস ঐরূপ শোভায় নিত্য-শোভিত।

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন পারিসে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইংলণ্ডের ডাইরেক্টার সভা হইতে এক খানি অভিনন্দন পত্র এবং একটী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তিনি স্বদেশের জন্য যত সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ঐ পদক, তাহার পুরস্কার স্বরূপ। তাঁহার প্রধান প্রধান কার্য্যের স্মরণ-সূচক শব্দ সকল ঐ পদকে খোদিত হইয়াছিল। গৃহে প্রত্যাগত হইয়াও, মহারাণীর নিকট হইতে আর এক খানি পত্র পান। মহারাণী, দ্বারকানাথকে তাঁহার নিজ গৃহে রাখিবার জন্য আপনার সম্পূর্ণ প্রতিচিত্র প্রদান করিবেন, ঐ পত্রে সেই কথা লিখিত হইয়াছিল। জন-সমাজে এক

প্রাধান্য লাভ করা, রাজ-দ্বারে এতাদৃশ সম্মান প্রাপ্ত হওয়া, কেহবা "কপালের কথা" বলিয়া মনকে প্রবোধ দেন; কেহবা "দ্বারকানাথ বড় ঘরের লোক, তাঁহার এরূপ হইবার অনেক যোগাড় ছিল" এইরূপ বলিয়া নিশ্চেষ্ট হয়েন। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে "কপালের কথায়" আমরা কোন কথা কহিতে সাহসী হইলাম না। কিন্তু পক্ষান্তরে বক্তব্য এই যে, বংশমর্য্যাদা, সম্পত্তি প্রভৃতি উচ্চ পদলাভে সহায়তা করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে, ঐ গুলি সজীব পদার্থ নহে। বংশমর্য্যাদাদি ত অনেকের আছে! তাঁহারা সকলেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের সদৃশ হন না কেন?

এক বৎসরের মধ্যেই দ্বারকানাথ দেশে প্রত্যাগত হয়েন। তিনি স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, স্বজাতির পরিত্রাণের অনেক উপায় অনুসন্ধান করিয়া, বুদ্ধি ও উদ্যোগিতার জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দেশে আইলেন, এ দিকে বাবুদিগের বৈটখানায় এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের টোলে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জাতি গিয়াছে বলিয়া গোল উঠিল। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দ্বারকানাথ যে পিরালি বংশের আভরণ স্বরূপ, সেই পিরালি ঠাকুরগণের মধ্যেও কেহ কেহ তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন। পরিশেষে, দেশীয় সমাজে স্থির

হইল, যদি দ্বারকানাথ জাতিচ্যুতি নিবন্ধন প্রায়শ্চিত্ত করেন, তবে তিনি সমাজভুক্ত হইতে পারিবেন। দ্বারকানাথ তাদৃশ প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন না দেখিয়া, ঐ গোলযোগে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।

এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, দ্বারকানাথের মনে প্রথম উদিত হয়। তিনি তদনুসারে গবর্ণমেণ্টে প্রস্তাব করিয়া তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু আমরা বলিতে পারি না, তিনি কি জন্য তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

তিনি (১৮৪৫ খৃঃ) ১২৫১ সালের ৮ মার্চ্চ পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে গমন করেন। নিজ ব্যয়ে বিলাত হইতে উত্তম রূপে সুশিক্ষিত করিয়া আনিবার জন্য মেডিকেল্ কালেজের দুই জন উৎকৃষ্ট ছাত্রকে সমভিব্যাহারে লইলেন। ছাত্র দুই জনের নাম ভোলানাথ বসু এবং সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী। এই সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীই "গুডিব্ চক্রবর্ত্তী" বলিয়া বিখ্যাত। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও, দ্বারকানাথের অনুকরণে আর দুই জন ছাত্র বিলাত পাঠান এবং তাহাদের ব্যয় দিতে স্বীকার করেন। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রধান সহায় ডেবিড্ হেয়ারের ভ্রাতার নাম, জোজেফ্ হেয়ার। দ্বারকানাথ ডেবিড্ হেয়ারের জীবনচরিত লিখিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতার নিকট বিবরণ সকল চাহিয়া-

ছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তাঁহার সে কার্য্যটী সম্পন্ন হয় নাই।

প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোন্ সাহেব একদা দ্বারকানাথকে আপন গৃহে আহ্বান করেন। ভারতবর্ষের হিতসাধন বিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হয়। দ্বারকানাথ মন্ত্রীবরকে জিজ্ঞাসা করেন, সুশিক্ষিত হিন্দুরা কেন মহাসভার সভ্য হইতে পারেন না? যে হেতু তদ্বিষয়ে কোন উপযুক্ত প্রতিবন্ধক দেখা যায় না। মন্ত্রিবর বলিলেন, হিন্দুধর্ম্মই সেই প্রতিবন্ধক; হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, পার্লিয়ামেণ্টের আসনে আসীন হইতে এবং সেখানকার নির্দ্দিষ্ট শপথ গ্রহণ করিতে পারেন না, খৃষ্টান ব্যতীত অন্যের তাহা অসাধ্য। দ্বারকানাথ অনেক সুযুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছিলেন, হিন্দুরা তাহা অবশ্যই পারেন; কিন্তু রাজমন্ত্রীর বিবেচনায় তাঁহার সেই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় নাই। এখন আর হিন্দুদিগের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশাধিকার বিষয়ে ইংলণ্ডে ঐ আপত্তি শুনা যায় না।

৩০ জুন তারিখে তিনি একটী ভোজের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। ঐ স্থানে হঠাৎ অত্যন্ত শীতানুভব হইয়া কম্পজ্বর হয়। নিমন্ত্রিতা রমণীগণ তাঁহার আকস্মিক পীড়া উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং আপনাদের গায়ের শাল সকল দ্বারকানাথের গায়ে

দিয়াছিলেন। তিন চারি জন ডাক্তার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন। এক মাস কাল ইতস্ততঃ বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইলেন। কিন্তু সকলই বৃথা হইল! (১৮৪৬ খৃঃ) ১২৫৩ সালের ১ আগষ্ট সবিরাম জ্বরে বেলফাষ্ট্ নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন বয়স বায়ান্ন বৎসর। যাঁহার পিতৃপিতামহগণের শব অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিরূপ হইবে, এই বিষয় লইয়া মহা গোলযোগ আরম্ভ হইল। তাঁহার সঙ্গে, তাঁহার পুত্র এবং ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বালক, সুতরাং যাহাতে ভাল হয়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিষয়ে তাঁহারা সেইরূপ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে কেন্‌সালগ্রীন্ নামক রমণীয় স্থানে তাঁহার শব সমাহিত হইল; কিন্তু সমাধানক্রিয়ার সহিত কোনরূপ খৃষ্টীয় আড়ম্বর করা হয় নাই। সমাধিস্তম্ভে রজতফলকে কেবল এইমাত্র খোদিত হইয়াছিল, "১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১ আগষ্ট কলিকাতার জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইল।"

তাঁহার মৃত্যুতে কি স্বদেশ কি বিদেশস্থ যাবতীয় পরিচিত স্ত্রীপুরুষের শোক হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু, বঙ্গ দেশের পক্ষে নিদারুণ ক্ষতি জনক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এতাদৃশ গৌরবপূর্ণ জীবন যত

দীর্ঘ হয়, দেশের ততই মঙ্গল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, দ্বারকানাথ তাদৃশ দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হন নাই। দ্বারকানাথ জাতিতে হিন্দু, ধর্ম্মেও হিন্দু ছিলেন। প্রথম বয়সে পূজা হোমাদির যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের সহিত বন্ধুত্ব-বন্ধনের পর হইতে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। তিনি এক পরমেশ্বরে এবং মনুষ্যের অনন্ত উন্নতির বিশ্বাস করিতেন। নিয়মিতরূপে স্নানের পর উপাসনা করিতেন। উপাসনার উপযোগিতায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল। প্রাচীন আর্য্যগণের উদার ভাবের অনুকরণে তাঁহার অনেক ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। ইংলণ্ডের টাইম্‌স নামক সর্ব্ব প্রধান সম্বাদ-পত্র সম্পাদক, দ্বারকানাথের মৃত্যুতে আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি দ্বারকানাথের যাবতীয় সৎ ও মহৎ কার্য্যের সমালোচনা করিয়া সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। এদেশের যেখানে যত সম্বাদ-পত্র ছিল, দ্বারকানাথের মৃত্যুতে সকলেই হাহাকার করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণার্থ ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ, এ দেশে অনেক সভা, অনেক বক্তৃতা ও অনেক চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছিল। সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে, এস্থলে আমরা তাহার কিঞ্চিন্মাত্রেরও উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে দ্বারকানাথ ঠাকুরের চরিত্র লিখিয়া উঠা একরূপ অসম্ভব ও অসাধ্য। যেহেতু, আমাকে চরিতাষ্টকের উদ্দেশ্যের অনুরোধে, কিয়ৎ পরিমাণে, স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কোন মহৎ ব্যক্তির জীবনের যে যে অংশ, বিদ্যালয়ের বালকেরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে, আমি তদ্ব্যতীত আর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। সুতরাং মহৎ ব্যক্তির চরিতালোচনায়, চরিতাষ্টকের ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভরসা করি, অন্যান্য পাঠকগণ এই ত্রুটির ক্ষমা করিবেন। দ্বারকানাথ কত বড় লোক ছিলেন, যাঁহারা ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে কিশোরী চাঁদ মিত্র সঙ্কলিত ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে।

দ্বারকানাথের সময়ে বাঙ্গালীর মধ্যে তত্তুল্য ক্ষমতাশালী বোধ হয়, আর কেহই ছিলেন না। স্বার্থ বিস্তৃত হইয়া পরার্থে পরিণত হয়। একটী বালক আপনার বিষয় যেমন বুঝে, পরের বিষয় তেমন বুঝে না। যত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে থাকে, অপরের বিষয় ততই বুঝিতে আরম্ভ করে। আত্ম কার্য্য সাধনে, আপনার সুখসচ্ছন্দতা বর্দ্ধনে, আপনার অভাবপূরণে, এবং সর্ব্ব বিষয়ে প্রাধান্য লাভে মানুষ যতই কৃতকার্য্য হইতে থাকেন, তাঁহার মন আপনার কার্য্য হইতে

বিরত হইয়া ততই পরের কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতে থাকে। তখন সেইরূপ অভিনেবেশেই অন্তরে সুখানুভব হয়। এইরূপে মানুষের মন, নিজ গৃহ,—নিজ পল্লী হইতে স্বগ্রামে,—অবশেষে স্বদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাকেই স্বদেশ-হিতৈষা কহে, ইহাকেই স্বার্থের বিস্তৃতি কহে। কার্য্যের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, দ্বারকানাথ স্বদেশ-হিতৈষী ছিলেন। অতএব তিনি প্রাধান্যলাভে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, ইহা দ্বারা তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

তিনি জমিদারী, ওকালতী, চাকরী ও নানাবিষয়ক বাণিজ্য দ্বারা অপরিমিত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এক দিকে যেমন অপরিমিত উপার্জ্জন, অন্য দিকে তেমনি অপরিমিত সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্ব্যয়ে অর্থ সার্থক হইয়াছিল। যাঁহাদের টাকা আছে, ব্যয় বিষয়ে তাঁহাদের দ্বারকানাথের অনুকরণ করা উচিত। তিনি অর্থ ব্যয় দ্বারা যত কার্য্য করিয়াছিলেন, অনেকে বলেন, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার এক একটী স্বার্থসিদ্ধির মতলব ছিল। যিনি যে কাজই করুন, সূক্ষ্ম দর্শনে দেখিয়া গেলে, তাহার কোন না কোন অংশে ঐরূপ মতলব সকলেরই দেখা যায়। ঐরূপ মতলব লোকের থাকে বলিয়াই জগতের কাজ হয়। যাঁহার ঐরূপ কোন মতলবই নাই, তিনি বাসনা বিহীন নিশ্চেষ্ট,—প্রকৃতির

স্রোতে ভাসমান। তাঁহার মানসিক সুখের অপ্রতুল নাই বটে, কিন্তু তিনি কাহাকে সে সুখের ভাগ দেন না। সামাজিকের মতলব থাকা আবশ্যক, যিনি আপনার মতলব সিদ্ধির উদ্দেশে শরীর শুষ্ক করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করেন, হৃদয়ের রক্ত জল করিয়া টাকা রোজকার করেন, যেখানে অভাব, সেই খানে অর্থবৃষ্টি করেন, নাম "কিনিবার" জন্য দেশ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, আমরা সেইরূপ লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধি দেখিতে ইচ্ছা করি। কাহার অতিশয় উচ্চ পদ দেখিলে, পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মনে কিঞ্চিৎ দ্বেষভাবের সঞ্চার হওয়া প্রকৃতির নিয়ম। বোধ হয়, তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে যিনি যাহা বলিয়া থাকেন, ঐ দ্বেষভাবই তাহার মূল। দ্বারকানাথ বাঙ্গালী ছিলেন, এ কথা স্মরন করা, বঙ্গবাসিগণের বিশেষ আনন্দের বিষয় তাহার সংশয় নাই।

সর্ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। K. C. S. I.

ইনি, কলিকাতার সিমলা স্থিত মাতুলালয়ে ১১৯১ সালের (১৭৮৪ খৃঃ) ১ চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি, সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র এবং রাজা গোপী-মোহন দেবের পুত্র। গোপী মোহন, নবকৃষ্ণের পোষ্য পুত্র, তাঁহার ঔরস পুত্রের নাম রাজা রাজকৃষ্ণ। এই দুই ভ্রাতার স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও কৌতুকাবহ, এই জন্য তাঁহাদের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক।

গোপীমোহন জ্যেষ্ঠ, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। এই জন্য যাবতীয় কাজ কর্ম্ম তিনি করিতেন, সকল বিষয়ে প্রাধান্য করিতেন এবং প্রাধান্য করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। পারসী ও আরবী ভাষায় তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান ছিল, অল্প সংস্কৃতও জানিতেন। রাজকৃষ্ণ পারসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, ঐ ভাষায় কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং ঐ ভাষাতেই সর্ব্বদা কথোপ-কথন করিতেন, বাঙ্গালা প্রায় কহিতেন না। মুসলমান পণ্ডিতেরা তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন, মুসলমান "ইয়ারেরা" তাঁহার মোসাহেব ছিলেন, মুসলমান পাচকে তাঁহার খাদ্য প্রস্তুত করিত। এতদ্ব্যতীত যে কোনরূপে মুসলমান

আদর্শ করিয়া ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, অনেক দূর সম্পন্নও হইয়াছিল; কিন্তু যন্ত্র বিজ্ঞানে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়নে বঞ্চিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার তাদৃশী প্রতিভা ও তাদৃশ অধ্যবসায় হইতেও আশানুরূপ ফল প্রসূত হয় নাই, ইহা ভাবিলে মনে বড়ই দুঃখ হয়। কিন্তু সে দুঃখ করা বৃথা! বর্ত্তমান কালে অনেকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইতেছেন, অনেকের প্রচুর অর্থও আছে; কই! তাঁহাদের ত এসকল বিষয়ে চেষ্টা হয় না! তাঁহারা চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন,— বাঙ্গালীর কপাল ফিরিবে, এই জন্যই বুঝি তাঁহাদের চেষ্টা হয় না। সঙ্গীতেও তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহারই যত্নে "হাপ্ আখ্‌ড়াইয়ের" সৃষ্টি হয়। ফলতঃ বড় মানুষের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, গোপীমোহনের সেসকলই ছিল। তিনি হিন্দু দলের দলপতি ছিলেন, সুতরাং যখন সতী-দাহ-নিবারণার্থ রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি চেষ্টা করেন, তখন তিনি ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ হইয়া তাহার প্রতিবাদ করেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, রাজকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে মুসলমান আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু অন্যের সহিত শত্রুতা সাধন সময়ে প্রয়োজন হইলে

আচার ব্যবহারের রক্ষা হইত তাহার অনুষ্ঠানে ত্রুটি ছিল না। "আমিরির" সীমা ছিল না, তিনি তৎকালের একজন প্রধান "ওমরাও" ছিলেন। গোপীমোহন পিতৃপিতামহের অনুসরণে সম্যক রূপে হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপকগণ সর্ব্বদা তাঁহার সভায় উপস্থিত হইতেন। তিনি তাঁহাদের শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিতেন। তাঁহাদের সহিত পদার্থ ও ন্যায়শাস্ত্রের বিচার করিতেন। তাঁহার ঐ দুই শাস্ত্র রীতিমত পড়া ছিল না, কিন্তু প্রতিভা দ্বারা উহা বুঝিতে ও তর্ক করিতে পারিতেন। ভুগোল ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি হিন্দু প্রণালীতে ভুগোলিক ও জ্যোতিষিক গ্লোব্ ও মান চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত জয়পুরপতি মহারাজ জয়সিংহের পর হিন্দু বিজ্ঞানে উৎসাহ প্রকাশ করিতে এবং তাহা রক্ষার অনুষ্ঠানে যত্ন করিতে গোপীমোহনের ন্যায়, আর কেহই উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। তিনি এই মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; বেতন দিয়া চীনদেশীয় শিল্পকরদিগকে নিকটে রাখিয়া বিবিধ যন্ত্র নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহাতেও তাঁহার অধ্যবসায় পরাহত হয় নাই। টানা পাখার কল নির্ম্মাণের ভাব, প্রথমে তাঁহার মনেই উদিত হয়। তিনি ঘটিকা

আদর্শ করিয়া ঐ যন্ত্র নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনেক দূর সম্পন্নও হইয়াছিল; কিন্তু যন্ত্র বিজ্ঞানে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়নে বঞ্চিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার তাদৃশী প্রতিভা ও তাদৃশ অধ্যবসায় হইতেও আশানুরূপ ফল প্রসূত হয় নাই, ইহা ভাবিলে মনে বড়ই দুঃখ হয়। কিন্তু সে দুঃখ করা বৃথা! বর্ত্তমান কালে অনেকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত হইতেছেন, অনেকের প্রচুর অর্থও আছে; কই! তাঁহাদের ত এসকল বিষয়ে চেষ্টা হয় না! তাঁহারা চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন,—বাঙ্গালীর কপাল ফিরিবে, এই জন্যই বুঝি তাঁহাদের চেষ্টা হয় না। সঙ্গীতেও তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহার যত্নে "হাপ্ আখ্ড়াইয়ের সৃষ্টি হয়। ফলতঃ বড় মানুষের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, গোপীমোহনের সকলই ছিল। তিনি হিন্দু দলের দলপতি ছিলেন, সুতরাং যখন সতী-দাহনিবারণার্থ রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি চেষ্টা করেন, তখন তিনি ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ হইয়া তাহার প্রতিবাদ করেন।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, রাজকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে মুসলমান আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু অন্যের সহিত শত্রুতা সাধন সময়ে প্রয়োজন হইলে

"হিন্দুয়ানি" অবলম্বনেও পরাঙ্‌মুখ হইতেন না। যখন রামদুলাল সরকার কালীপ্রসাদ দত্তের উদ্ধার সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন রাজকৃষ্ণ বিলক্ষণ বিপক্ষতা করেন। বোধ হয়, প্রথমে পিতা ও জ্যেষ্ঠের প্রভাবে তিনি উভয় কুল বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে তিনিও সমাজ-চ্যুত হন এবং নিজ পুত্রের বিবাহকালে হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইবার জন্য সম্বর করিতে বাধিত হন। গীত বাদ্যে রাজকৃষ্ণের বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে গাইতে ও বাজাইতে পারিতেন। সঙ্গীত-সাধনী-শক্তি অপেক্ষা সঙ্গীত বিজ্ঞানে তাঁহার অধিক পাণ্ডিত্য ছিল। এই জন্য ভাল ভাল মুসলমান সঙ্গীতবিৎ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিত।

রাজকৃষ্ণ অকর্ম্মণ্য এবং আচার ভ্রষ্ট, অতএব সম্পত্তির সমাংশ পাওয়া তাঁহার পক্ষে কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে; গোপীমোহন এইরূপ মনে করিতেন। রাজকৃষ্ণ মনে করিতেন, তিনি, রাজা নবকৃষ্ণের ঔরস পুত্র এবং গোপীমোহন পোষ্যপুত্র; অতএব তিনি কখনই তাঁহার সহিত তুল্যাংশ পাইতে পারেন না। পিতার মৃত্যুর পর উভয় ভ্রাতার মনের ভাব ঐরূপ হইয়াছিল। গোপীমোহন সম্পত্তি বিভাগের জন্য দুইটা তালিকা প্রস্তুত করিলেন। একটাতে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভাল ভাল যাবতীয় বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী, তালুক ইত্যাদি লিখিত হইল। অপরটীতে

দূরবর্ত্তী অধিক লাভ জনক ভূসম্পত্তি সকল লিখিত হইল। ঐ তালিকা দুইটী এমন চতুরতা সহকারে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, রাজকৃষ্ণ প্রথম তালিকানুযায়ী অংশ লইতেই প্রলোভিত হইলেন। কিন্তু বন্ধুগণের পরামর্শে শেষোক্ত তালিকানুরূপ সম্পত্তি লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গোপীমোহন, আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়া তাহাতে আপত্তি করিতে বাধ্য হইলেন। পরিশেষে আদালতের সহায়তায় উভয়ে সমান অংশ প্রাপ্ত হন।

গোপীমোহন বদান্য ছিলেন। সঙ্গীত ও সাহিত্যের উন্নতি জন্য অনেক টাকা দান করিতেন। বাঙ্গালী ও ইংরাজ উভয় সম্প্রদায়েই তাঁহার সম্মান ছিল। লর্ড বেণ্টিক্ বাহাদুরের সহিত, সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে তাঁহার একবারমাত্র অনৈক্য হয়, তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রেই লর্ড বাহাদুর তাঁহার সম্মান করিতেন। ১২৪৩ সালে (১৮৩৬ খৃঃ) একমাত্র পুত্র রাধাকান্তকে রাখিয়া তিনি পরলোক গত হন। রাজা রাজকৃষ্ণ ১২৩১ সালে, দেহ ত্যাগ করেন।

রাধাকান্ত দেব অতি শিশু কালেই তৎকাল প্রচলিত রীত্যনুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে শিক্ষার্থ নিযুক্ত হন। ঐ পাঠশালে যে, সুশিক্ষার সুন্দর উপায় নাই, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ঐ পাঠশালার প্রধান শিক্ষা অঙ্ক, রাধাকান্ত তাহা উত্তমরূপে শিখিয়া-

ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা তখন ভাল ছিল না, উহা তখন শিখিবার মত ভাষা ছিল না, উহাতে উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি ছিল না। গুরু মহাশয়ের পাঠশালার অশুদ্ধ লিখন ও পঠনই বাঙ্গালার সর্ব্বস্ব ছিল। ঐ সকল অশুদ্ধি নিবারণ ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বাড়ীতে এক জন সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। তদ্ব্যতীত একজন মুন্সী, পারসী ও আরবী পড়াইতেন। পারসীর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল পাঠ করায় বাল্যকালেই তিনি সুশীল, সুসভ্য ও বিনম্র হইয়া ছিলেন। তাঁহার শিখিবার শক্তি অসাধারণ ছিল! শীঘ্র শীঘ্র অনেক বিষয় শিখিয়া ফেলেন। সম বয়স্ক ও সতীর্থ যাবতীয় ছাত্রকে, তিনি অল্প দিনের মধ্যেই অতিক্রম করিলেন। সংস্কৃত, আরবী ও পারসী এই তিন ভাষায়, শিশু কালেই একরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রাধাকান্তের তত অল্প বয়সে সেরূপ শিক্ষা নৈপুণ্য দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইতেন। যখন দেশ মধ্যে সভ্যতা কি সুশিক্ষার তত প্রচলন হয় নাই, সেই সময়েও তিনি অসাধারণ সুশিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। তবু তখনও তাঁহার কিছু মাত্র ইংরাজী শিখা হয় নাই। রাজা নবকৃষ্ণ অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শনের দ্বারা জানিয়াছিলেন যে, তখন যেরূপ সময় আসিতে ছিল, তাহাতে ইংরাজী শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্য তিনি পৌত্র রাধাকান্ত দেবকে কামিং

সাহেবের বউবাজারস্থ "কলিকাতা একাডমি" নামক ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। সেখানেও এত সত্বর ইংরাজী শিখিলেন যে, তৎকালে তিনি এক জন প্রধান ছাত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। তিনি যে, কেমন উৎকৃষ্টরূপে ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, তাহার একটি প্রমাণ আছে। ১২৩১ সালে (১৮২৪ খৃঃ) বিসপ হবার আপনার প্রকাশিত কোন সাময়িক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, "রাধাকান্ত উত্তমরূপে ইংরাজী কহিতে পারেন,—বিখ্যাত ইংরাজী লেখকগণের সমস্ত গ্রন্থই তিনি পাঠ করিয়াছেন; বিশেষতঃ, ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকই তাঁহার পড়িতে বাকী নাই।" তাঁহার শিক্ষাতৃষা, কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইত না, যেখানে যে কোনরূপ ভাল পুস্তক বা পত্রিকা পাইতেন, তাহাই পাঠ করিতেন। তিনি শিক্ষিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রচলিত রাজনীতির পর্য্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন; তাহাতেও কৃতকার্য্য হয়েন। উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি হইয়াছিল।

তিনি পিতৃ পিতামহের দৃষ্টান্তানুসারে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিতেন। সাহেব বা মুসলমান হইতে পারেন নাই। এই জন্য নব্য সম্প্রদায়েরা তাঁহাকে প্রাচীনের দলে ফেলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বা হিন্দু আচার ব্যবহারশীল

অনেকে আছেন, তাঁহাদিগের উপর কাহারই দৃষ্টি পড়ে না। রাধাকান্ত সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকের অপেক্ষা অনেক অধিক লেখা পড়া শিখিয়াও যে, "হিন্দুয়ানি" রক্ষা করিয়া চলিতেন, এই জন্যই তাঁহাকে তরুণগণের উপহাসাস্পদ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, এই ব্যবহারটী তাঁহার মহত্ত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। যেটী ছোট, সেটী বড়র অনুকরণ করে। আপনারে, আপনার আচার ব্যবহার অথবা বিদ্যা বুদ্ধিকে, সামান্য জ্ঞান না হইলে আর অন্যের প্রতি মহৎ-বুদ্ধির উদয় হয় না। আমাদের অপেক্ষা, সাহেবদের সব ভাল, এরূপ জ্ঞান অগ্রে হয়, পরে আমরা সাহেব হইবার চেষ্টা দেখি। যাহার একটুমাত্র আত্মগৌরব আছে, সে সহজে পরের পোসাক পরিতে চাহে না। এরূপ হইতে পারে, আত্ম-গৌরবের অনুরোধে যাহার অনুকরণ করা হইল না, তাহার মহত্তর গুণ আছে। তথাপি, এরূপ স্থলে, অন্ততঃ অনুকরণের প্রলোভন ত্যাগ নিবন্ধন একাংশে অননুকারীর মহত্ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সাহেবরা আমাদের দেশের রাজা, বিদ্যা ও ক্ষমতায় প্রধান; তঁহাদের সহিত আনুগত্যে আমাদের লাভ আছে, যাঁহারা এভাবে বিলাতীয় বেশ গ্রহণের ক্লেশ স্বীকারে বাধিত হন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কোন কথা নাই। রাজা

রাধাকান্ত দেব কি কারণে সাহেব হইতে পারেন নাই, তাহা আর এক বার পরিস্ফুট রূপে বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ, তিনি আপনাকে এবং আপনাদের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারকে সামান্য জ্ঞান করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, অন্যে সাহেব হইয়া দেশের যে উপকার করেন, তাঁহার অমনিই তাহা করিবার ক্ষমতা ছিল। তৃতীয়তঃ, তাঁহার পিতা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বিতীয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, পিতৃ পরলোকান্তে রাধাকান্তও সেই প্রাধান্য প্রাপ্ত হন। উহা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছিল।

পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশের কি অসাধারণ পরিবর্ত্তনই উপস্থিত হইয়াছে। এখন যে কাজ সহজ হইয়া উঠিয়াছে, ঐ সময়ে তাহা নিতান্ত কঠিন ছিল। যে ইংরাজী শিখিয়া বাঙ্গালার এত উন্নতি হইয়াছে, পূর্ব্বে সেই ইংরাজী শিখাতেই বা কত আপত্তি ছিল। ঐ সকল শুভ কার্য্যের বিঘ্ন নষ্ট করিবার জন্য কত লোককে কত পরিশ্রম ও কত যত্নই করিতে হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, হিন্দুছাত্রগণের শবব্যবচ্ছেদার্থ আপত্তি নিরাকরণ করিতে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে কতই যত্ন করিতে হইয়াছিল। হিন্দুকালেজ *

* পূর্ব্বে ইহার নাম "মহাবিদ্যালয়" ছিল, ক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া এক্ষণে হিন্দুকালেজ হইয়াছে।

ও স্কুলবুক্ সোসাইটী সম্বন্ধে রাধাকান্তকে তদপেক্ষাও যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। হিন্দু কালেজের স্থাপন বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা সরহাইড্ ইষ্ট্ ডেবিড্ হেয়ার এবং ডাক্তার উইলসন্ সাহেবের সহিত রাধাকান্ত সমপরিমাণে শ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ৩৪ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের প্রশংসার সহিত ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর সংস্কৃত কালেজেরও সেক্রেটারি ছিলেন। বাঙ্গালার মধ্যে রাধাকান্তের ন্যায়, কেহই ঐ বিষয়ে যত্ন করেন নাই। কালেজের প্রথমাবস্থায় হিন্দুগণ বালক পাঠাইতে অসম্মত হইতে লাগিলেন। কারণ খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারই কালেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া ছিলেন। কালেজের বালকগণকে খৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইবে না, রাধাকান্তকে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইল। তিনিই সমস্ত ঝোঁক ঘাড়ে করিয়া লইলেন। হিন্দুগণের আর কোন আপত্তি রহিল না। পরে পাঠ্য পুস্তক লইয়া আর এক গোল উঠিল। তখনকার প্রচলিত যাবতীয় পুস্তকই প্রায় খৃষ্টীয় উপদেশ পূর্ণ ছিল। বিশেষতঃ একবার বাছিয়া বাছিয়া কেবল খৃষ্টীয় উপদেশ সংসৃষ্ট প্রস্তাব সকলই বালকগণের পাঠার্থ নির্ব্বাচিত করা হয়। রাধাকান্ত এই সম্বাদ পাইবামাত্র কালেজের অধ্যক্ষকে পত্র লিখিলেন, যে এতাদৃশ পুস্তক কালেজের

পাঠ্যরূপে গৃহীত হইলে, হিন্দুরা একটী বালকও পাঠার্থ পাঠাইবেন না। রাধাকান্তের পরামর্শে অধ্যক্ষ আপন প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিলেন। এই সকল সঙ্কট গেল, আবার অন্যবিধ সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। উৎকৃষ্ট ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক সকল সংগ্রহ ও প্রণয়নার্থ ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্ট স্কুলবুক সোসাইটী স্থাপিত করিলেন। রাধাকান্ত উহার বাঙ্গালা বিভাগের সেকরেটারি হইলেন। বিবিধ পুস্তক সঙ্কলিত ও প্রণীত হইতে লাগিল। কিন্তু দেশে গোল উঠিল যে ঐ সোসাইটীর দ্বারা প্রকাশিত পুস্তক পড়িলেই হিন্দু বালকেরা খৃষ্টান হইয়া যাইবে। এবারও রাধাকান্ত পূর্ব্ব রূপে হিন্দু সম্প্রদায়কে অভয় দান করিলেন যে, ঐ সকল পুস্তক পাঠে খৃষ্টান হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হিন্দু সম্প্রদায় নিরস্ত হইলেন। এখন এ সকল কথা অনেকের পক্ষে উপহাসের বিষয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এককালে বাঙ্গালা দেশ এইরূপ ছিল। এস্থলে আর একটী কথা বলিয়া যাওয়া আবশ্যক। এদেশে ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা প্রচলিত হইবার প্রথমাবস্থায় যে যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, বোধ হয়, তৎকালে তাহা নিবারণ করিতে একমাত্র রাধাকান্তই সক্ষম ছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম্মে ও হিন্দু আচার ব্যবহারে আস্থাবান ছিলেন বলিয়াই তাঁহার ঐ ক্ষমতা ছিল। তিনি হিন্দুসম্প্রদায়ের বিশ্বাস

ভাজন ছিলেন; এইজন্য তিনি যখন যাহা বলিতেন, তাহাতেই লোকে বিশ্বাস করিত। সুতরাং সহজে সকল গোল মিটিয়া গেল। বোধ হয়, এমন স্থলে হিন্দুর অপ্রিয় ব্যক্তিগণের কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন হইত। যাঁহারা তৎকালে "হিন্দুয়ানি" রাখিতে লজ্জা বোধ করিতেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন এবং দেখিতেছেন যে রাধাকান্তের "হিন্দুয়ানি" কত কাজে লাগিয়াছিল।

রাধাকান্ত দেব সব প্রথমে ইংরাজী পুস্তকের অনুকরণে বাঙ্গালা বর্ণপরিচয় ও নীতিকথা নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রচার করেন। তদ্ব্যতীত আরও কয়েকখান বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের "রয়াল এসিয়াটিক্ সোসাইটি" তাঁহার প্রথম বাঙ্গালা পুস্তক সকলের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১২২৯ সালে তাঁহার সুবিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুমের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ঐ সুবিশাল অভিধান গ্রন্থের সঙ্কলনে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, কিরূপ অক্ষয় কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র কিরূপ স্মৃতি-স্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার লক্ষ লক্ষ সাক্ষী বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু না বলিলেও চলে। তথাপি যথাস্থানে এবিষয়ে আর কিছু বলা যাইবে।

স্কুলবুক্ সোসাইটির তৎকালীন প্রধান পণ্ডিত গৌর-

মোহন বিদ্যালঙ্কারের সহযোগিতায় রাধাকান্ত দেব একখানি পুস্তক বাহির করেন। স্ত্রীগণকে লেখা পড়া শিখান অশাস্ত্রীয় নহে এবং পূর্ব্ব কালের স্ত্রীরা সুশিক্ষিত হইতেন, ঐ পুস্তিকায় তাহাই প্রতিপন্ন করা হয়। যখন দেশের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার প্রচলিত ছিল; স্ত্রী, লেখা পড়া শিখিলে স্বামীর মৃত্যু হয় এরূপ ভাবও, স্ত্রীগণের মন অধিকার করিয়া ছিল, তখন একজন হিন্দু-প্রধানের হাত হইতে ঐরূপ পুস্তক বাহির হওয়ায় হিন্দু-সম্প্রদায় রাধাকান্তের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। রাধাকান্ত প্রথমে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং নিরুৎসাহী হন নাই। কিন্তু তাঁহার মনের ভাব বরাবর এরূপ ছিল না। যাহা হউক, আপনার অন্তঃপুরস্থা স্ত্রীগণের মধ্যে শিক্ষা দানের উপায় করিয়া দিলেন। নিজ গৃহস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালে ছোট ছোট বালিকাদিগকে শিক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। স্কুল কমিটীর দ্বারা কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ছাত্রীদিগকে আপনার বাড়ী আনিয়া পারিতোষিক দিতে লাগিলেন। এইরূপ সর্ব্বতোভাবে স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয় দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত করার মত, পরে ত্যাগ করিয়া ছিলেন। যখন বেথুন সাহেব বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন, রাধাকান্ত তাহাতে

প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন। সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে আপন মতে আনিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের অন্তঃপুর-শিক্ষায় এবং ছোট ছোট বালিকাদিগকে আপন আপন গৃহস্থ পাঠ-শালে শিখাইতে বাধা দিতেন না। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন, স্কুল কমিটীর বালিকা-বিদ্যালয় সকলের মন্দ ফল দেখিয়া তিনি এরূপ মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। একবার কলিকাতার সহকারী বিশপ্ করি সাহেব রাধাকান্তের বাড়ীতে বালক বালিকাগণের পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি রাজার সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার অসাধারণ গুণের কথা শুনিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট রাজাসম্বন্ধীয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

রাধাকান্তের কার্য্যক্ষমতা, দেশহিতৈষা প্রভৃতি অনেক দিন হইতেই গবর্ণমেণ্টের গোচর হইয়াছিল। ১২৮২সালে (১৮৩৫খৃঃ) গবর্ণমেণ্টের দ্বারা রাধাকান্তের ঐ সকল গুণের পুরস্কার হয়। ঐ সালে তিনি কলিকাতার জষ্টিস্ অব্ দি পিস্ এবং অবৈতনিক মাজিষ্টরের পদ পান। এখন এদেশের অনেকে ঐ সকল পদ পাইয়াছেন, কিন্তু সে সময়ে উহা বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ সম্মানের বিষয় ছিল। পর বৎসর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে গবর্ণমেণ্ট

তাঁহাকে রাজা বাহাদুর উপাধি দিলেন। ঐউপাধির সঙ্গে তাঁহাকে রাজোচিত পরিচ্ছদ, রত্নহার এবং অসিচর্ম্ম পারিতোষিক দেওয়া হয়। ১২৪৯ সালে তিনি গয়ায় যান। তথায় টিকারির রাজার সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে উভয়কে উপহার প্রদান করেন। যাইবার সময় মুরসিদাবাদের নবাব নাজিমের "দরবার" দেখিয়া যান। নবাব, রাজা বাহাদুরকে অনেক মূল্যবান্ উপহার দিয়াছিলেন।

রাজা বাহাদুরের সময়ে টাকির বৈকুণ্ঠনাথ মুন্সী অতিশয় দুষ্টতা ও দুর্ব্বৃত্ততা নিবন্ধন বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার অনেক পত্তনি তালুক ছিল। কিন্তু জমিদারকে প্রায়ই সে সকলের খাজানা দিতেন না। অথচ এমন চতুরতার সহিত ঐ কার্য্য সাধন করিতেন যে, তাঁহার পত্তনি তালুক সকল সরকারী নিলাম হইতেও রক্ষা পাইত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কড়া আইন সত্ত্বেও তিনি এইরূপ কাজ নিয়তই করিতেন। রাজা রাধাকান্তের নিকটও তিনি পত্তনি রাখিতেন। কোন সময়ে তাঁহার সঙ্গেও ঐরূপ ব্যবহার করেন। রাজা তাঁহার অত্যাচার নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। এই সূত্রে বৈকুণ্ঠের সহিত রাজার ঘোরতর বিবাদ হয়। রাজা ভাল মানুষ এবং বৈকুণ্ঠ বিখ্যাত দুষ্ট ও ক্ষমতাশালী। সুতরাং বৈকুণ্ঠের দ্বারা রাজা বাহাদুরকে যার পর নাই ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। সভাবাজারে বৈকুণ্ঠনাথের একটু

ভূমি ছিল। বৈকুণ্ঠ সেই স্থানে নূতন বাজার করিয়া, রাজার উৎকৃষ্ট বাজার ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে অনেক "দাঙ্গা হেঙ্গাম" ও অনেক গোলযোগ হইয়াছিল। তজ্জন্য রাজা বাহাদুরকে অনেক কষ্ট ও অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। বৈকুণ্ঠের সহিত বিবাদ ইহাতেও শেষ হয় নাই। হুগলী জিলার অন্তর্গত মনোহরপুরে ১২৫৫ সালে উভয়ের মধ্যে একটী ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হয়। দেশাধিকার প্রভৃতি গুরুতর কারণে রাজায় রাজায় যে রূপ যুদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাকে সেইরূপ একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। ঐ যুদ্ধে বৈকুণ্ঠের পরাজয় হয়। তাঁহার পক্ষে ২০ জন হত ও বহু সংখ্য লোক আহত হয়। রাজার ৩ জন হত ও কয়েক জন মাত্র আহত হইয়াছিল। এই বিবরণ তৎকালীন "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী সম্বাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। গবর্ণর বাহাদুর লর্ড ডাল হাউসী তৎ পাঠে পুলিসের প্রতি সবিশেষ অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন। অনুসন্ধান করা হইল। বৈকুণ্ঠনাথ চতুরতা সহকারে মোকর্দ্দমার বিলক্ষণ তদ্বির করিলেন। রাজা হুগলীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তিন বৎসর কারাবাসের অনুমতি পাইলেন। এই ঘটনায় তাঁহার, আত্মীয় স্বজনের এবং দেশের যে তাঁহাকে জানিত সকলের দুঃখের পরিসীমা ছিল না।

সদর আদালতে আপিল করা হইল। সদর হইতে হুগলীর সেসন্ জজের উপর বিচারের ভার দেওয়া হয়। দুইজন সেসন্ জজ্ এই গুরুতর মোকর্দ্দমা হাতে লইতে স্বীকার করেন নাই। এই বিচার শীঘ্র শেষ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টও অল্প উৎসুক হন নাই। রবর্ট টরেন্স্ নামক এক জন অতিরিক্ত জজ্ ঐ বিচার করিবার জন্য নিযুক্ত হন। ১৯ অক্টোবর আরম্ভ হইয়া ২৬ নবেম্বর পর্য্যন্ত ক্রমাগত ৩৯ দিনে বিচার শেষ হয়। ঐ বিচার দেখিবার জন্য হুগলীতে এত অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, বাজারে এক টাকায় চারিখানি কলা পাত বিক্রয় হয়। ইহার পূর্ব্বে এমন গুরুতর বিচার আর কখন হয় নাই। যাহা হউক বিচারে রাজা নিষ্কৃতি পাইলেন, দর্শকগণের জয়ধ্বনি ও আনন্দ-ধ্বনিতে হুগলী পরিপূর্ণ হইল। সদর আদালতের বিচার পতি সর রবর্ট বার্‌লো সাহেবের আদেশে তিনি পূর্ব্বেই জামিন দিয়া কারামুক্ত হইয়াছিলেন। এক অন্ধকারময় অপরিষ্কৃত কুঠরীতে তাঁহাকে তিন দিনমাত্র বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই তিন দিনের দুঃখের সহিত তুলনা করিলে, তাঁহার সমস্ত জীবনের সুখও অল্প বোধ হয়।

রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার শব্দকল্পদ্রুম সংগ্রহে জীবনের অধিক ও উৎকৃষ্টাংশ ব্যয় করিয়াছিলেন।

ঐ কার্য্যে তিনি ৪০ বৎসর শ্রম করেন। ইহা দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের কিরূপ উপকার হইয়াছিল এবং স্বদেশ ও বিদেশস্থ জ্ঞানিগণ ইহাকে কিরূপ প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, তাহা নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিবরণ দ্বারা সপ্রমাণ হইবে। ১২৬৬ সালে (১৮৫৯ খৃঃ) দেশস্থ সমস্ত প্রধান প্রধান লোক একত্র সমাগত হইয়া শব্দকল্পদ্রুম প্রণয়ন জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। মহারাণী ভিক্টরিয়া ঐ জন্য এক স্বর্ণ পদক উপহার দেন। এতদ্ব্যতীত সেণ্ট-পিটার্সবর্গ, বার্লিন, বিয়েনা, লণ্ডন, পারিস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের রাজকীয় সাহিত্য সমাজ হইতে শব্দকল্পদ্রুমের প্রশংসাবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। ইয়ুরোপের রাজগণ তাঁহার বিদ্যা ও গ্রন্থের প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। রুসিয়ার সম্রাট ও ডেন্ মার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডরিক তাঁহার নিকট স্বর্ণ পদক উপহার পাঠাইয়া ছিলেন। চারি মহাদেশের যেখানে যত প্রধান পুস্তকালয় আছে, শব্দকল্পদ্রুম সে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে। মাদ্রাজের কোন প্রধান ব্যক্তি, তদ্দেশ প্রচলিত সংস্কৃত মূলক কোন ভাষায় (টেলুগ) শব্দকল্পদ্রুম অনুবাদ করিবার জন্য রেঃ কৃষ্ণ বন্দ্যোর দ্বারা রাজার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। যতদিন পৃথিবীতে সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা থাকিবে তত-

দিন রাধাকান্তের নাম অনেকের মনে প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় রহিবে।

তাঁহার সময়ে এ দেশে সাধারণের হিতকর যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, প্রায় তৎ সমুদায়ে সঙ্গেই তাঁহার সংস্রব ছিল। কেবল মাত্র সংস্রব নহে, তিনি সর্ব্বত্র প্রধান ছিলেন। পূর্ব্বে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। আর কয়েকটী নিম্নে সংকলিত হইল। এ দেশীয় স্কুল সকলের উন্নতি সাধন ও অভিনব স্কুল স্থাপনের জন্য "স্কুল সোসাইটী" বলিয়া একটী কমিটী ছিল। রাধাকান্ত ঐ কমিটীর সেকরেটারি ছিলেন। এ দেশের কৃষি ও উদ্যানকার্য্যের উন্নতি করিবার জন্য যে রাজকীয় সমাজ আছে, রাধাকান্ত তাহার সহকারী সভাপতি ছিলেন। ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এছোছিয়েসনের স্থাপনাবধি (১৮৩৮ খৃঃ) তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। নাখেরাজ বাজে আপ্ত করিবার আইনে প্রতিবাদ করিবার জন্য এদেশীয় অষ্ট সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইয়া এক সভা করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি নিয়মিত রূপে হেয়ার সাহেবের স্কুলের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিতেন। তিনি এদেশের স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম পথ প্রদর্শক। যদি ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্ত্রী-

শিক্ষার উল্লেখ হয়, তবে সে স্থলে অবশ্যই লিখিতে হইবে যে, বালিকাগণকে লেখা পড়া শিখিতে উৎসাহ দিবার জন্য রাধাকান্ত দেবের বাটীতে প্রথম পারিতোষিক বিতরণ করা হয়।

তাঁহার অন্তঃকরণ উদার ও প্রশস্ত ছিল। তিনি ধর্ম্মান্ধ হিন্দুর ন্যায় অনিষ্টকর প্রথার অনুষ্ঠান বা প্রচলনে উৎসুক ছিলেন না। তাঁহার সময়ে এ দেশের এক জন প্রধান ক্ষমতাশালী লোক ইয়ুরোপ দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হন। কয়েক জন "ধার্ম্মিক" তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার জন্য রাজার সহিত পরামর্শ করেন। রাজা তাঁহাদের পরামর্শ শুনেন নাই। অধিকন্তু "যিনি ইয়ুরোপ দর্শনে অভিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহা দ্বারা এদেশের অনেক মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। বিলাত গিয়া তিনি ঘৃণার পাত্র হন নাই, প্রত্যুত অধিকতর সম্মানের ভাজন হইয়াছেন।" ইত্যাদি উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে তাদৃশী দুশ্চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করেন। অনেকে বলেন, তিনি কতকগুলি হিতানুষ্ঠানে বাধা দিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা জানি তিনি প্রকৃত হিতানুষ্ঠানে কখনই বাধা দেন নাই। এ দেশের লোকদিগকে বিলাত পাঠাইবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতেন। মেডিকেল্ কালেজের শবব্যবচ্ছেদে তিনি আপত্তি করেন নাই। তিনি ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনায়

জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে পর্য্যটক ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ক শ্রম, ধরামণ্ডলের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়াছিল।

১২৭৩ সালে (১৮৬৬ খৃঃ) মহারাণী, ভারতবর্ষের হিতৈষী প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে একটী উপাধি দিবার প্রস্তাব করেন। ঐ উপাধির নাম ভারত-নক্ষত্র (ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া)। ঐ সালের নবেম্বর মাসে আগরার মহা দরবারে গবর্ণর সর জন্ লরেন্স বাহাদুর দ্বারা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রথমে ঐ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি দ্বারা তৎকালে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল। ঐ উপাধি এবং উহার আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটী উপাধি তিনি প্রাপ্ত হন। তৎ সূচক ইংরাজী শব্দ ও বর্ণ সকল তাঁহার নামের পূর্ব্বে ও পরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ স্থলে তাহার সবিশেষ বর্ণন অনাবশ্যক।

রাজা রাধাকান্ত দেব এইরূপে জীবন কার্য্য,—মনুষ্য জীবনের উপযুক্ত কার্য্য শেষ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বিষয় চিন্তা বিরহিত হইয়া বৃন্দাবনের পরম রমণীয় পবিত্র স্থানে গিয়া বাস করেন। প্রাচীন কালের ঈশ্বর পরায়ণ পবিত্র-চরিত্র ঋষিগণের ন্যায় তিনি ঈশ্বর চিন্তায় ও শাস্ত্র চিন্তায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইরূপে পৃথিবীর শান্তি-সুখ অনু-

ভব করিতে করিতে ভক্তি ভাজন হিন্দু-হিতৈষী সর রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর ১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খৃ ১৯ এপ্রিল শুক্রবার অপরাহ্ণ দুইটার সময়ে) ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বৃন্দাবনে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু বঙ্গদেশের এক সাধারণ শোকাবহ ঘটনা রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ এবং তাঁহার চিরস্থায়ী স্মরণ-চিহ্ন রক্ষা করিবার জন্য ঐ সালের ১৪ মে তারিখে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ এছোছিয়েসনের গৃহে এক সভা হয়। ঐ সভায় এ দেশের যাবতীয় বড় লোক এবং এ দেশস্থ ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি সকল উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ দেশীয় কাহার মৃত্যু উপলক্ষে এমন সভা ও এমন উৎকৃষ্ট বক্তৃতা আর কখন হয় নাই।

তাঁহার গভীর বিদ্যা, নানাবিষয়িনী শিক্ষা, দেশের হিতানুষ্ঠানে অসাধারণ পরিশ্রম এসকল ব্যতীত তাঁহার উৎকৃষ্ট চরিত্র, মনোজ্ঞ স্বভাব ও পবিত্র ধর্ম্ম ভাবেরও অনেক প্রমাণ আছে। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সর লরেন্স পীল বলিয়াছিলেন,—"রাধাকান্ত ভদ্রতার সুস্পষ্ট চিত্রস্বরূপ, এবং তাঁহার আচার ব্যবহার, আমাদের সকলেরই অনুকরণীয় আদর্শ।" তাঁহার উচ্চ ও পবিত্র ধর্ম্মভাবের বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় না

করিয়া রেঃ ডল্ সাহেবের সহিত তাঁহার এক দিনকার কথোপকথন নিম্নে সঙ্কলন করিলাম। বোধ হয়, তাহাতেই তাঁহার ধর্ম্ম ভাবের বিশেষ পরিচয় দেওয়া হইবে। তাঁহাকে অনেকে পৌত্তলিক বলিয়াছেন এবং এখনও অনেকের ঐরূপ সংস্কার আছে। তাঁহার বাটীতে তন্নির্ম্মিত দেব মন্দির এবং তন্মধ্যস্থ নয়প্রকার ধাতু নির্ম্মিত কৃষ্ণমূর্ত্তি, তাঁহার পৌত্তলিকতার প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইত। রেঃ ডল্ একদা তাঁহার বাটীতে যান এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—

রাজন্! আপনি পুতুল পূজা করেন?

রাজা কহিলেন, না, মানুষে কখন পুতুল পূজা করিতে পারে না। আমার বালক দিগের জন্য মন্দিরে পুত্তলিকা রাখিয়াছি।

আবার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তোমরা কি তোমাদের বালকগণকে পুতুল দেও না?

ডল্।—খেলা করিবার জন্য দেই, পূজা করিবার জন্য দেইনা।

রাজা।—আমাদের বালকেরা পুত্তলিকার সাহায্য ব্যতীত যত দিন প্রকৃত পূজায় সমর্থ না হয়, আমরা ততদিন তাহাদিগকে পূজা করিবার জন্য পুত্তলিকা দিয়া থাকি।

ডল্।—যদি আপনি পুতুল পূজা না করেন, তবে কাহার পূজা করেন?

রাজা। আমি আমার ধর্ম্মের পূজা করি। আমার ধর্ম্ম,—সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য এবং নির্ব্বাণ *। ঈশ্বরের সহিত একস্থানে বাস করা, ক্রমে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হওয়া, ঈশ্বরের সহিত আপনাকে অভিন্ন জ্ঞান করা এবং ইন্ধনশূন্য অনলের ন্যায় ক্রমশঃ ঈশ্বরে বিলীন হওয়া।

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, বিশেষতঃ ধনী লোকের সন্তানেরা রাধাকান্তের ন্যায় এমন আদর্শ আর পাই-বেন না। অধিকাংশ ধনী সন্তান এইরূপ মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের ক্লেশ স্বীকারের, তত প্রয়োজন নাই। এইজন্য অনেককে অল্পকাল মাত্র বিদ্যালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা দেখুন, রাধাকান্ত যেরূপ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন এবং যেরূপ মনুষ্যত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, কেবল মাত্র ধনে তাহা হইতে পারে কিনা! একজন সুবিখ্যাত ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, "উচ্চ পদ অনুবীক্ষণ স্বরূপ" ইহাতে ছোট বস্তু বড় দেখায়। যদিও রাধাকান্তের গুণ ও বিদ্যাকে অধিক করিয়া দেখিবার নিমিত্ত কোন যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন হইত না, তথাপি তিনি সামান্য দুঃখীর সন্তান হইলে, এত কৃতকার্য্য হইতে, এত মহত্ব ও যশঃ লাভ

শি—বিহায় সর্ব্বসঙ্কল্পান্ বুদ্ধ্যা শারীরমানসান্।
শনৈর্নির্ব্বাণমাপ্নোতি নিরিন্ধন ইবানলঃ॥

করিতে পারিতেন কি না তদ্বিষয়ে সংশয় হয়। অতএব যাঁহাদের অন্নবস্ত্রের চিন্তায় শরীর মন খিন্ন করিতে না হয়, জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার যথেষ্ট অবসর আছে, কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে; তাঁহারা উচ্চপদের সহায়তা ত্যাগ করিয়া বালিশের দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া কাল না কাটান, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিখ্যাতবাগ্মী রামগোপাল ঘোষ।

কলিকাতা নগরে ১২২১ সালের আশ্বিন মাসে (১৮১৫ খৃঃ) রামগোপাল জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ। পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। গোবিন্দের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। কথিত আছে, তিনি কলিকাতার কোন সওদাগরি আফিসে সামান্য কর্ম্ম করিতেন এবং কোচবেহারের রাজার মোক্তার ছিলেন। রামগোপাল সিরবোরন্ সাহেবের ইংরাজী স্কুলে প্রথম শিক্ষা প্রাপ্ত হন। রামগোপালের জন্ম গ্রহণের পর বৎসরেই এদেশীয় ও বিদেশীয় প্রধান প্রধান লোকের যত্নে হিন্দুকালেজ স্থাপিত হয়। বোধ হয়, যেন, রামগোপালকে ভাল করিয়া ইংরাজী শিখাইবার জন্যই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুকালেজের অধিষ্ঠান হইয়াছিল। যখন তাঁহার নয় বৎসর বয়স, তৎকাল-সংঘটিত একটী বৃহৎসামান্য ঘটনা, তাঁহাকে যাবতীয় ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ দেখাইয়া দেয়।

একদিন তাঁহার নিজ বাটীতে একটী বিবাহের সভা হইয়াছিল। প্রচলিত রীত্যনুসারে বালকেরা বর ও তৎপক্ষীয় ব্যক্তিগণের সহিত কৌতুক করিতে ছিল।

রামগোপালও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া বরকে মিথ্যা ইংরাজীতে বিদ্রূপ করিতেছিলেন। যদিও সে ইংরাজীর কোন অর্থ ছিল না, কিন্তু তাহার উচ্চারণও স্বরসঙ্গতিতে সভাস্থ সকলেই বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা রামগোপালকে পরামর্শ দিলেন যে, তিনি যদি ভাল করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করেন, ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট বক্তা হইতে পারিবেন। এই উপদেশ রামগোপালের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। আপনাকে হিন্দুকালেজে নিযুক্ত করাইবার জন্য পিতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। তখন হিন্দুকালেজের প্রতি ছাত্রের বেতন পাঁচ টাকারও অধিক ছিল। যদিও রামগোপালের পিতার তত অধিক বেতন দিবার সঙ্গতি ছিল না, তথাপি পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে হিন্দুকালেজে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

রামগোপাল যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষা-শক্তি দেখিয়া তাঁহার উপর শিক্ষক ও অধ্যক্ষগণের দৃষ্টি পড়িল। ডেবিড্ হেয়ার সাহেব তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। রামগোপালের পিতা কালেজের বেতন দিয়া উঠিতে পারেন না দেখিয়া উক্ত সাহেব তাঁহাকে অবৈতনিক ছাত্রগণের মধ্যে গণ্য করিয়া লইলেন। রামগোপাল ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃ নিরলস ছিলেন,

বিশেষতঃ পিতার অবস্থা মন্দ দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র কালেজের পড়া সারিয়া কাজের লোক হইবার এবং পরিবার পোষণ বিষয়ে পিতার সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার যত্ন ও শ্রমের সীমা ছিল না। চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই তিনি কালেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন। যখন যে শ্রেণীতে শিক্ষা করিতেন, সকল ছাত্রের প্রধান হইয়া থাকিতেন। এই সময়ে হেনরি লুইস্ বিবিয়ান্ ডিরোজিও নামক এক জন সাহেব কালেজের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। তিনি অতিশয় চিন্তাশীল ও তার্কিক ছিলেন। ইয়ুরোপীয় প্রাচীন ও মধ্যকালের দার্শনিকগণের অনেক গ্রন্থ তাঁহার পড়া ছিল। নিজেও গ্রন্থকার ছিলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহাকে এক জন প্রধান বিদ্বান্ বলিয়া জানিতেন। শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাদান করিয়া এতাদৃশ ব্যক্তির কখনই তৃপ্তি হইতে পারে না। তিনি কালেজ হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান ছাত্র লইয়া একটী বিশেষ শ্রেণী স্থাপন করিলেন। কালেজের ছুটীর পর তাহাদিগকে লইয়া উচ্চধরণের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি এই শ্রেণীর প্রধান ছিলেন। ডিরো-

জিও, লক্, রিড, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা-দিগের পুস্তক অবলম্বনে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষা প্রণালী অতি চমৎকার ছিল। ঐসকল দুরূহ গ্রন্থের ভাব, তিনি অতি সহজে তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন। তিনি নীতিবিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রেরই অধিক উপদেশ দিতেন। এইরূপে ডিরোজিওর শিক্ষায় একদিকে যেমন তাঁহাদিগের ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি, এবং স্বাধীন চিন্তা ও তর্কশক্তির স্ফুর্ত্তি হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল। এই দল হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে বিলাতীয় খাদ্য ও বিলাতীয় সুরার প্রচলন আরম্ভ হয়। ক্রমে তাঁহারা এত বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলেন যে, কালেজের দেশীয় অধ্যক্ষগণ তদ্দর্শনে ভীত হইলেন। রামগোপাল সকলের অপেক্ষা অধিক সাহসী ও অধিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন; আবার সকলের অপেক্ষা দূরদর্শন ও আত্মসংযমের ক্ষমতা তাঁহার অধিক ছিল। তিনি ডিরোজিওর উপদেশ বুঝিতে যত যত্ন করিতেন, নিষিদ্ধ খাদ্যাদির ব্যবহার দ্বারা জ্ঞানের পরিচয় দিতে তত ব্যগ্র হইতেন না। এই জন্য তিনি একদিন লক্ পড়িতে পড়িতে এমন একটী সুন্দর অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ছিলেন, যাহা শুনিয়া ডিরোজিও বিস্মিত হন। রামগোপাল

বলেন,—"লক্, বুদ্ধি বৃত্তির বিবরণটী প্রাচীনের মস্তক ও বালকের ভাষার দ্বারা রচনা করিয়াছেন।" ইহার তাৎপর্য্য এই, বুদ্ধি বৃত্তি বিষয়ক সুকঠিন ভাব সকল এমন সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহা বালকেও বুঝিতে পারে। যাহা হউক, ডিরোজিওর শিক্ষায় তাঁহাদের আচার ব্যবহার যতই ভ্রষ্ট হউক, সেই শিক্ষায় যে, তাঁহারা মানুষ হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে অন্যাপেক্ষা অধিক উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই।

রামগোপালের শিক্ষা বিবরণ অধুনাতন ইংরাজী শিক্ষার্থি-বালকগণের অনুকরণীয়। কিন্তু এখনকার শিক্ষা ও পরীক্ষা প্রণালী সেরূপ অনুকরণের প্রতিবন্ধক। রামগোপালের সময়ে কালেজে এখনকার মত রাশীকৃত পুস্তক পড়ান হইত না। লক্ ও ষ্টুয়ার্টের দর্শন শাস্ত্র, সেক্স্পিয়ারের নাটক, রাসেলের ইয়ুরোপ বৃত্তান্ত এবং পদার্থ বিদ্যার উপক্রমণিকা এইমাত্র রামগোপাল প্রধান রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত তর্কসভায় নানা বিষয়ের বিচার ও কথোপকথন করিতেন। ডিরোজিও উন্নত ও প্রশস্ত ভাব সকল তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। এই সকল উপায়ে এবং এইরূপ সুপ্রণালীতে তিনি কিরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন এবং বরযাত্রি-গণের ভবিষ্যংবাণী কিরূপ

সফল করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অল্পে অল্পে ইন্ধন প্রদান করিলে অল্প আগুণও প্রবল ও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। এককালে অধিক কাঠ চাপাইলে প্রবল আগুণও নিবিয়া যায়। রামগোপাল ইহার প্রথমটীর সুন্দর প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন এবং এখনকার শিক্ষা বিভাগে দ্বিতীয়টীর প্রমাণ দেখা যাইতেছে। এখনকার বালকেরা স্বভাবতঃ যে বুদ্ধি, উৎসাহ ও শ্রমশক্তি লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, শিক্ষা প্রণালীর দোষে সে সকলের স্ফূর্ত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অনেককে তাহা সমূলে হারাইয়া আসিতে হয়। ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। একজন বঙ্গ কবি, প্রচলিত প্রণালীতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে একটী সুন্দর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "কোন কোন বিলাতী দেসলাই যেমন আপন বাক্সের পার্শ্ব ভিন্ন অন্য স্থানে ঘষিলে জ্বলে না, সেই রূপ এখনকার শিক্ষিতগণের বুদ্ধি, পঠিত পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র দীপ্তি পায় না।" যাহা হউক, ডিরোজিওর শিক্ষায় হিন্দু ছাত্রেরা আচার ভ্রষ্ট ও নীতিভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া দেশীয় অধ্যক্ষেরা উক্ত শিক্ষককে পদচ্যুত করিবার জন্য উপরিতন কর্ত্তৃ পক্ষের নিকট অনুরোধ করিলেন। যে সকল ছাত্রের দোষ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকেও তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব করা হইল। ডিরোজিও, উত্তম

রূপে আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিলেও পদচ্যুত হইলেন। তাঁহার পদচ্যুতিতে উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণ অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইলেন। ইচ্ছা পূর্ব্বক অনেকে কালেজ ছাড়িলেন। রামগোপালেরও কালেজ ছাড়িয়া কাজ কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হইল। এই সময়ে জোজেফ্ নামক এক জন ইহুদি জাতীয় বণিক, কলভিন কুটীর অধ্যক্ষ আণ্ডারসন্ সাহেবের নিকট একজন ভাল বাঙ্গালী কর্ম্মচারী প্রার্থনা করেন। আণ্ডারসন্, ডেবিড্ হেয়ারকে হিন্দু কালেজের এক জন উৎকৃষ্ট ছাত্র পাঠাইতে বলেন। কালেজে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি রামগোপালের উপর ডেবিডের দৃষ্টি ছিল। তিনি সকলের অপেক্ষা রামগোপালকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রত্যুৎপন্নমতি বলিয়া জানিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রে ভাগ্য পরীক্ষার্থ তিনি রামগোপালকেই জোজেফের নিকট পাঠাইলেন। রামগোপাল যখন জোজেফের আফিসে কর্ম্ম করিতে গেলেন তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। জোজেফ্ যেরূপ লোক চাহিয়াছিলেন, সেই রূপ পাইলেন। রামগোপালের বিদ্যা, কার্য্য দক্ষতা ও নিরালস্য দেখিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ রামগোপাল একবার তাঁহার প্রভুর আদেশে এদেশের উৎপন্ন ও শিল্পজাত দ্রব্য সকলের রপ্তানি বিষয়ে এমন একখানি সুন্দর রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন,

এবং তাহাতে এত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তদ্দর্শনে তাঁহার প্রভু যারপর নাই সন্তুষ্ট হন এবং তাহা হইতে তিনি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্ধান পান। রামগোপাল বণিকদিগের কুটীর কাজে প্রথম প্রবিষ্ট, এই জন্য উক্ত কার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা না থাকায় হরিমোহন সরকার ঐ কুটীর মুচ্ছদ্দি হন এবং রামগোপাল তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। রামগোপাল পরিশ্রম ও মনোযোগ সহকারে প্রভু কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিলেও মানসিক উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলের উন্নতি সাধনে নিবৃত্ত হন নাই। তিনি ইতি-হাস, কাব্য ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের নিয়তই আলোচনা করিতেন। সেকস্‌পিয়ারের নাটক তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি নিজ বাটীতে বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া ঐ কাব্যের গুণ ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন। প্রতি শনিবার অপরাহ্নে হিন্দু কালেজে গিয়া উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের সহিত ইংরাজী সাহিত্যের আলো-চনা করিতেন। তখন স্পীড্‌ নামক এক জন সাহেব কালেজের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি বালকগণের বর্ণাশুদ্ধি শোধন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। রামগোপাল বলিতেন, একটী মাত্র বর্ণাশুদ্ধি দ্বারা বড় বড় বিদ্বানেরও সাহিত্য জ্ঞান বিষয়িনী সুখ্যাতি নষ্ট হয়। এই জন্য তিনি স্পীড্‌ সাহেবের উপদেশানুসারে শ্রুত

লিখন বিষয়েও বিশেষ মনোযোগ করিতেন। এতদ্ব্যতীত মাণিকতলার শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাগানে একটী সাহিত্যালোচনার সভা ছিল, রামগোপাল নিয়মিতরূপে ঐ সভাতেও উপস্থিত হইতেন। কারণ তাঁহার পূর্ব্বোপদেষ্টা ও পরম বন্ধু ডিরোজিও সাহেব ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি যে বাগ্মীতা নিবন্ধন দেশ বিদেশে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, যে বাক্শক্তির বলে দেশের অনেক উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই সভায় তাহার সূত্রপাত হয়। তিনি বাক্ পটুতা লাভের জন্য নিয়মিতরূপে বক্তৃতা করিতেন। এই সভার এমন নাম বাহির হইয়াছিল যে, লর্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ বাহাদুর আপনার কার্য্যাধ্যক্ষ দ্বারা উহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

এই সময়ে তাঁহার সহাধ্যায়ী রসিককৃষ্ণ মল্লিক "জ্ঞানান্বেষণ" নামক একখানি সম্বাদ পত্র প্রচার করিতেছিলেন। রামগোপাল তাহাতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তিনি দেশীয় বাণিজ্য ও রাজনীতি বিষয়েই অধিক প্রস্তাব লিখিতেন। আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক থাকিবে কি উঠিয়া যাইবে, গবর্ণমেণ্টে যখন এইরূপ আন্দোলন হইতেছিল, তখন রামগোপাল উক্ত কাগজে ঐ বিষয়ে "সিভিস" স্বাক্ষরিত কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। অনেকে বিশ্বাস করেন, ঐ অনিষ্টকর শুল্ক

রহিত বিষয়ে রামগোপালের পত্র সকল বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। "জ্ঞানান্বেষণ" বন্ধ হইলে, কিশোরীচাঁদ মিত্রের সম্পাদিত "বঙ্গ দর্শক" পত্রে সময়ে সময়ে লিখিতে লাগিলেন। এখন তিনি আপনার কাজে এত অধিক ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, ইচ্ছানুরূপ প্রস্তাব লিখিতে অবসর পাইতেন না।

জোজেফ্ রামগোপালের কাজে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এত অধিক বিশ্বাস করিতেন যে, কয়েক বৎসর পরে তিনি যখন বিলাত যান, তাঁহার কুঠীর যাবতীয় কার্য্যভার রামগোপালের উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। রামগোপালও সেই বিশ্বাসের উপযুক্ত কার্য্য করেন। জোজেফ্ প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, রামগোপালের কর্ত্তৃত্বে তাঁহার কার্য্যের অধিকতর উন্নতি হইয়াছে এবং আশাতীত লাভ দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে রামগোপালের উপর তাঁহার সন্তোষ ও বিশ্বাসের ইয়ত্তা রহিল না। কিছুদিন পরে কেল্‌সল্ নামক একজন সাহেব, জোজেফের অংশী হইলেন। ঐ সময়ে রামগোপাল ঐ কুঠীর মুচ্ছুদ্দি হইলেন। যখন তাঁহার তত্ত্বাবধানে কুঠীর কাজ সুচারু রূপে চলিতেছিল সেই সময়ে মনোবাদ হওয়ায় দুই সাহেব পৃথক্ হইলেন এবং স্বতন্ত্র ভাবে কাজ চালাইতে লাগিলেন। রামগোপাল তাঁহার পূর্ব্ব সহায় আওয়র-

সন্ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া কেল্‌সলের দিকে রহিলেন। বুদ্ধি, বিজ্ঞতা, পরিশ্রম ও ন্যায়পরতা দ্বারা পূর্ব্ব প্রভুর ন্যায় অভিনব প্রভুরও প্রিয় ও বিশ্বাস ভাজন হইলেন। কয়েক বৎসর পরেই তিনি ঐ কুঠীর অংশী হইলেন এবং ঐ কুঠির নাম "কেল্‌সল্, ঘোষ এণ্ড কোং" হইল।

এইরূপে তিনি ইংরাজ বণিকগণের সহযোগী হইয়া বহু সম্মান ও বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন। ১২৫৭ সালে বণিক্ সভার মেম্বর হইলেন। স্বভাব পূর্ব্ববৎ রহিল। এখনও তিনি পূর্ব্ব বন্ধুগণের সহিত সমান বন্ধুত্ব করিতেন। যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক উন্নত হইয়াও তাঁহাদের দ্বেষ বা হিংসার ভাজন হন নাই। তাঁহার যেমন প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল, তিনি তেমনিই বাবুগিরি করিতে লাগিলেন। তিনি খরচ পত্র বিষয়ে অতিশয় মুক্ত হস্ত ছিলেন, কোনরূপ ব্যয়ে কিছুমাত্র কুণ্ঠতা প্রকাশ করিতেন না। তিনি কামারহাটী নামক স্থানে একটী উৎকৃষ্ট বাগান ভাড়া লইয়াছিলেন, তথায় "রাজার হালে" বাস করিতেন। বন্ধু বর্গকে নিয়তই ভোজ দিতেন। এ ছাড়া তিনি আপনার ব্যবহার জন্য ভাগীরথীতে এক খানি ষ্টিমার রাখিয়াছিলেন, শারীরিক স্বাস্থ্য বর্দ্ধনার্থ বন্ধু বান্ধব

লইয়া মধ্যে মধ্যে জল বেড়াইতে যাইতেন। "লোটাস" ঐ ষ্টিমারের নাম রাখিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে মনুষ্য জীবনের উপভোগ্য বিষয় কি এবং তাহা প্রকৃতরূপে ভোগ করিয়া ছিলেন। আপনার কার্য্য ও আপনার সচ্ছন্দতা ব্যতীত মানুষের অধিকতর তুষ্টিকর আরও একটী কাজ আছে, ইহা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগিত। কিরূপে দেশের লোকের প্রকৃত শিক্ষা হইবে, কিরূপে গবর্ণমেণ্টের সুশাসন বৃদ্ধি হইবে, কিরূপে জিতগণের উপর জেতৃগণের অত্যাচার নিবারিত হইবে, কিরূপে সুশিক্ষিত দেশীয়গণ লাভজনক ও গুরুভারবহ রাজকর্ম্ম সকল প্রাপ্ত হইবে,—সৌভাগ্য ও বিলাসে তাঁহাকে এ সকল ভুলাইতে পারে নাই।

রামগোপাল যে সময়ে সম্বাদ পত্রে হিতকর প্রস্তাব সকল লিখিতেন, সেই সময়েই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য তিনি আর একটী সভা স্থাপন করেন। তিনিই ঐ সভার প্রধান ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার সহযোগী ছিলেন। রামগোপালের কার্য্য বাহুল্য প্রযুক্ত তারাচাঁদ বাবুই ক্রমে তাহার প্রধান হইয়া উঠেন। বাকপটুতা ও রাজনীতির আলোচনায় যে সকল ব্যক্তি তৎকালে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন, এই সভাই তাঁহাদের প্রথম শিক্ষা স্থান।

অক্স্ফোর্ড কালেজের ছাত্র-সভা, বিলাতী বাগ্মীগণের যেরূপ সাহায্য করিয়াছিল, এই সভা এদেশীয় বক্তাদিগের সেইরূপ সাহায্য করে। প্রথমে হিন্দুকালেজের "হলে" এই সভার অধিবেশন হইত, পরে কোন ভদ্র লোকের বাটী, সভার স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। যাহাহউক, যখন তাঁহারা প্রাগুক্ত বিষয় সকল অবলম্বনে নবোপার্জ্জিত বাক্ পটুতা সহকারে বক্তৃতা করিয়া সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর, পার্লিয়া-মেণ্টের পূর্ব্বতন সভ্য বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টম্সন্ নামক একজন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইলেন। নূতন ভাবে ও নূতন চিন্তা সহকারে ঐ সভার বক্তৃতা শুনিয়া এদেশের প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞ সাহেবেরাও চমকিয়া উঠিতেন। জর্জটম্সনের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া রামগোপাল অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। "যে যাহা চায় সে তাহা পায়।" এই প্রবাদ সার্থক মনে করিলেন। রাজনীতি বিষয়িণী বক্তৃতা করিতে ও শুনি-তেই তাঁহার অন্তর নিয়ত উৎসুক ছিল। জর্জ্জটম্সন্‌কে প্রত্যুদ্গমন করিয়া সভায় আনিলেন। সাহেব তাঁহাদের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং একটী বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দেন। বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সচরাচর যেরূপ বক্তৃতা হইয়া থাকে, টম্সনের বক্তৃতা সেই জাতীয়। ইহার পূর্ব্বে

ভারতবাসিগণ এমন বক্তৃতা আর কখন শুনেন নাই। এই বক্তৃতার পর রামগোপালের সভার প্রকৃতি ও নাম পরিবর্ত্তিত হইল। শেষে উহার "বেঙ্গল ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটি" এই নাম হইয়াছিল।

একদিন "লোটাসেঁ" জল বেড়াইতে ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত স্পীড্, জর্জ টম্‌সন্ এবং অন্যান্য অনেকগুলি দেশীয় বন্ধুর সহিত আমোদ করিতেছিলেন। স্পীড্ সাহেবও বক্তৃতা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতৃগণের ধৈর্য্য থাকিত না, বরং তাঁহারা বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। বক্তৃতা, গল্প, কথোপকথন খুব আমোদ হইতেছে, "লোটাস্" ধীরে ধীরে জাহ্নবীর মৃদু স্রোতের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে চলিতেছে, এমন সময়ে অন্যান্য নৌকা হইতে "বান ডাকিবার" গোল উঠিল। তৎকালে বান অত্যন্ত প্রবল হইত। ভয়ে সকলে উদ্বিগ্ন হইলেন, তীরে যাইবার জন্য রামগোপালকে পরামর্শ দিলেন। রামগোপাল হাসিতে হাসিতে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন,—"বোরে* আমার ভয় হওয়া অসম্ভব কারন আমি বহুক্ষণ ধরিয়া স্পীড্ সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়াছি।" এস্থলে কথার মিষ্টতা ছাড়া রামপোগালের সাহস ও স্পষ্টবাদিতাও প্রকাশ হইয়াছিল।

---

* "বোর" শব্দের দুইটী অর্থ; বান এবং যে ব্যক্তি এক রূপ শব্দ ও ভাব বারম্বার প্রকাশ করিয়া বিরক্ত করে। *

তিনি, অল্প বুদ্ধি ক্ষমতা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন। তাঁহার পর যে সকল ব্যক্তি বিলাতী কুটীর অংশী বা মুচ্ছদ্দি হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে রামগোপালের সাহায্যই অনেকের প্রধান সম্বল ছিল। তিনি এদেশীয় ব্যক্তিগণের লেখা পড়া শিক্ষা বিষয়ে অনেক উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন। তিনি একবার কোন নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে একহাজার টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন। আর একবার, মার্সমান সাহেবের ভারত ইতিহাসের একশত খণ্ড নিজ ব্যয়ে ক্রয় করিয়া পারিতোষিক দিয়াছিলেন। হিন্দুকালেজের ভাল ভাল ছাত্রদিগকে তিনি বর্ষে বর্ষে বহু সংখ্য স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত পদক পারিতোষিক দিতেন।

রামগোপাল কেল্‌সাল্‌ সাহেবের সঙ্গে ১২৫৩সাল (১৮৪৬খৃঃ) পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই নির্ব্বিঘ্নতা বরাবর ছিল না। পর বৎসর ইংরাজদিগের কুটির কাজের বড় ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছিল। দেউলিয়া হইয়া অনেক বণিককে কুটির কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছিল। রামগোপালও এই গোলযোগে বিপদে পড়িয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে পাওনা টাকার বিল, বিলাতের বণিকদিগের নিকট পাঠাইয়া ছিলেন। এদেশে বাণিজ্যের অসুবিধা হওয়ায় তিনি সেই সকল টাকা পাইবেন কি না

তাহাতে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। সে টাকা না পাইলে তাঁহাকে এক কালে নিঃস্ব হইয়া পড়িতে হইত। এই সময়ে তাঁহার বিষয় সকল "বেনামি" করিতে অনেকে পরামর্শ দিয়া ছিলেন। বিষয় "বেনামি" করিয়া পাওনাদারকে ফাকি দেওয়া এদেশের অনেকের স্বভাব ছিল এবং অদ্যাপি আছে। কিন্তু রামগোপাল ঐ প্রস্তাবে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, "যদি দেনা পরিশোধ করিতে পরিধেয় বস্ত্রও বিক্রেয় করিতে হয়, তাহাও করিব" এই কথা বলিয়া ছিলেন। যাহা হউক, সৌভাগ্য বশতঃ তিনি বিলাত হইতে বিলশোধ টাকা পাইয়াছিলেন, এদেশীয় মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তাঁহাকে এক পয়সাও লোকসান্ দিতে হয় নাই। ইহার কিছু কাল পরে অংশী সাহেবের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মনোবাদ হওয়ায় সাহেবের সহিত ব্যবসায় সংস্রব ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তিনি আপন লাভ স্বরূপ দুই লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎসদৃশ "সাখরচে" লোকের পক্ষে দুই লক্ষ টাকা যথেষ্ট নহে। কিছু কাল কর্ম্ম কাজ শূন্য হইয়া রহিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব সহায় আণ্ডারসন্ সাহেব তখন বিলাতে ছিলেন। তিনি কাজ কর্ম্মের কোন সুবিধা করিয়া দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া রামগোপাল তাঁহাকে পত্র লিখিলেন।

এই পত্রের উত্তর আসিবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালা গবর্ন-মেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতার ছোট আদালতের বিচার-পতি নিযুক্ত করিতে চাহেন। তিনি কখনই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির লুন খান নাই, এই জন্য অনেক বিবেচনার পর ঐ পদ গ্রহণ অস্বীকার করিলেন। ইতি মধ্যে বিলাত হইতে পত্রের উত্তর আইল। আণ্ডার্‌সন্‌ সাহেব রামগোপালকে স্বয়ং কুটী করিতে পরামর্শ দিলেন এবং আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে, রামগোপালের কুটির সহিত সংসৃষ্ট একটী কুটি বিলাতে স্থাপন করিলেন। রামগোপালের কুটির "আর, জি, ঘোষ এণ্ড কোং" এই নাম হইল। রামগোপাল বেশ সুবিধার সহিত কাজ চালাইতে লাগিলেন। তিনি এই সঙ্গে আকায়েবে একটী কুটি স্থাপন করিয়া আরাকান দেশোৎপন্ন চাউলের কারবার আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। তিনি অনন্যাপেক্ষ হইয়া স্বয়ং কারবার আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার ন্যায়-পরতা ও সত্যনিষ্ঠাই এত উন্নতির কারণ। তিনি ঋণ পরিশোধ বিষয়ে অত্যন্ত বাঙ্‌নিষ্ঠ ছিলেন। মহাজনেরা তাঁহার কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। কথিত আছে, কোন সময়ে একজন ধনী কোন খত্‌ বা বন্ধক না লইয়া তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। ইহাতে ধনীর আত্মীয়েরা তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার

করেন। ধনী, তাহার এই মাত্র উত্তর করেন যে, "পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইলেও রামগোপাল আমাকে ঠকাইবে না।" এই রূপে রামগোপাল আপন কাজের যেরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ লিখিয়া উঠা যায়না।

জর্জটম্‌সনের যত্নে ও বক্তৃতায় রামগোপালের রাজনৈতিক সভার অধিকতর উন্নতি হইয়াছিল; কিন্তু তিনি হঠাৎ এদেশ ত্যাগ করায় সভা ভাঙ্গা পড়িয়াংগেল। বোধ হয়, যেন আবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তির সহিত গাত্রোত্থান করিবার জন্যই সভার অবনতি হইয়াছিল। রামগোপালের দ্বিগুণ যত্নে ও পরিশ্রমে সভার কাজ আবার উত্তমরূপে চলিতে লাগিল। এই সময়ে ফৌজদারি বালাখানায় সভার অধিবেশন হইত। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই সাহেব ও সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের মধ্যে মনোবাদ চলিয়া আসিতে ছিল। সাহেবদের বিবেচনায় তখনকার সুশিক্ষিতগণ অত্যন্ত অবিনয়ী হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে হেতু তাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালিদের ন্যায় সাহেবদের সম্মান করেন না এবং জেতৃগণের সঙ্গে রাজনৈতিক সমান স্বত্ব ভোগ করিতে চান। রামগোপালের সভার বক্তৃতা দ্বারা সুশিক্ষিতগণের মত সমর্থিত হইত। এই জন্য এই সময়ে ঐ মনোবাদ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ঐ সময়ে গবর্নমেণ্টে একটী

ফৌজদারি আইনের পাণ্ডুলিপির বিচার হইতেছিল। তাহাতে সাহেব ও বাঙ্গালিদিগকে এক বিধ শাসনের অধীন করা প্রস্তাবিত হইয়াছিল। রামগোপালের সভা উহার পক্ষতা করিয়াছিলেন। সাহেবেরা ইহা জানিতে পারিয়া "তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেলেন।" রামগোপালই, "অসমান ব্যক্তিগণের মধ্যে সমতা স্থাপনের মূল," ইহা স্থির করিয়া তাঁহার উপর বিদ্বেষ প্রকাশ ও তাঁহার দুর্নাম রটনা করিতে লাগিল। ইহাতে রামগোপাল আত্ম-পক্ষ সমর্থন ও সাহেবদের অনৈসর্গিক ভাবের বর্ণন করিয়া চল্লিশ পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি পুস্তিকা বাহির করেন। তাহা দেশ বিদেশ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালির অনুকূলে উপরি উক্ত আইনটী প্রস্তাবিত হইয়াছিল বলিয়া, সাহেবেরা উহাকে "ব্ল্যাক্ একট্" বলিতেন। এই নাম এখনও জনসমাজে পরিচিত।

তিনি এদেশের শিক্ষোন্নতি সম্বন্ধে অনেক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তিনি, শিক্ষা বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ড্রিঙ্ক্ ওয়াটার বেথুন্ সাহেবের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে যেখানে যে কিছু হিতকর অনুষ্ঠান হইত, রামগোপাল সর্ব্বত্রেই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। হুগলী কালেজের উন্নতি পক্ষে তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষং কার্য্যোপলক্ষে তিনি হেলিডে,

বিডন্, গ্রাণ্ট, ডালহৌসী, ম্যাডক্ প্রভৃতি মহামান্য সাহেবদিগের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া সহযোগিতা করিতেন। এতদ্ব্যতীত যেখানে যত, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক সভা ছিল, কিম্বা হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান বা অনিষ্টকর নিয়মাদির পরিবর্ত্তন জন্য সময়ে সময়ে যে সকল সভাধিবেশন হইত, সর্ব্বত্রেই রামগোপালের কার্য্য ক্ষমতা প্রকাশ পাইত। একবার শিক্ষা বিভাগ হইতে এইরূপ একটী নিয়ম হয় যে, তৎকালীন বারতীয় বাঙ্গালী স্কুলমাষ্টারদিগকে বাঙ্গালী ভাষার একটী নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা দিতে হইবে, উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে চাকরী যাইবে। রামগোপাল প্রতিবাদ করিয়া এই নিয়ম রহিত করিয়া দেন। তাঁহার প্রতিবাদের মূল যুক্তি এই, যাঁহারা বালককাল হইতে কেবল মাত্র ইংরাজী ভাষার আলোচনা করিয়াছেন, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখেন নাই, হঠাৎ তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা পরীক্ষার অধীন করিয়া বিপদে ফেলা অন্যায়। কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণে গড়ের মাঠে পূর্ব্বতন গবর্ণর হার্ডিঞ্জ সাহেবের যে প্রতিমূর্ত্তি অশ্ব পৃষ্ঠে দৃষ্ট হয়, তাহা রামগোপালের মনঃসম্ভূত। কয়েক জন ক্ষমতাশালী বক্তা ঐ রূপ মুর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামগোপাল তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া আপনার মত বজায় রাখিতে

অসমর্থ হন নাই। কোন বিষয়ের তত্ত্বধান বা অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে সময়ে সময়ে যে কমিটী নিযুক্ত করিতেন, তাহার কোনটীই রামগোপালকে ছাড়িয়া হইত না। ১২৫৫ সালে তিনি কলিকাতার ডিস্‌ট্রিকুট দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেম্বর হন।

যখন ১২৬০ সালে (১৮৫৩ খৃঃ) কোম্পানির সনন্দ পরিবর্ত্তনের এবং ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালী সংশোধনের প্রস্তাব পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় উত্থাপিত হইয়াছিল, তখন রামগোপাল মনে করিয়াছিলেন যে, এখন তাঁহার অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নয়। তিনি টাউন্‌ হলে একটী সভা আহ্বান করিলেন। ঐ সভায় দেশীয় সকল শ্রেণীর লোকই উপস্থিত হইয়াছিল। উহাতে প্রায় দশহাজার লোকের সমাগম হয়। রামগোপাল একখানি চেয়ারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চ ও স্পষ্ট স্বরে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বিষয় এই ছিল যে, ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষিতগণের "সিবিল্‌-সরবিসে" প্রবেশাধিকার পাওয়া উচিত। হ্যালিডে সাহেব "দেশীয়গণকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত নহে" বলিয়া পার্লিয়ামেণ্টে তাহার এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে দেশীয় সুশিক্ষিতগণকে উক্তবিধ উচ্চপদ দিলে তাহাদের শক্র বৃদ্ধি করা হইবে। রামগোপাল প্রথমে বিশেষরূপে এই যুক্তির খণ্ডন করি-

লেন। পরে, দেশীয়গণকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিয়া, উচ্চপদলাভে বঞ্চিত রাখার যে রাজনীতি তাহার সম্যক্ দোষ প্রদর্শন করিলেন। রামগোপাল সুদীর্ঘ ও সুফল দায়িনী বক্তৃতা শেষ করিলে প্রশংসাবাদে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। সররাজা রাধাকান্তদেব এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি রামগোপালকে বলিলেন, "ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, তুমি এইরূপে চিরকাল স্বদেশের হিত সাধন কর। তুমিই আমাদের সকলের মুখপাত, তুমিই আমাদের জাতির আভরণ।" রামগোপাল ইহার উত্তরে বিনিতভাবে বলিলেন—"আমি বক্তৃতায় কৃতকার্য্য হইয়াছি, একথা আপানর মুখে শুনিয়া আমার মনে গর্ব্ব উপস্থিত হইতেছে। স্বদেশ আপনার কাছে অধিক ঋণী, কারণ আমাপেক্ষা আপনার অধিক উপকারের ক্ষমতা আছে।" বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া দেশ বিদেশে প্রেরিত হইল। ইহা ইংলণ্ডস্থ ব্যক্তিগণেরও হৃদয় ভেদ করিল। অনেক পত্রিকা সম্পাদক, সুবিখ্যাত বার্ক ও সেরিডেনের বক্তৃতার সহিত ইহার তুলনা করিতে লাগিলেন। ঐ বক্তৃতা পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রীরা ভারতবর্ষের বিষয় সবিশেষ রূপে জানিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারী কর্ম্মত্যাগ করিয়া তৎকালে স্বদেশে বাস করিতে

ছিলেন; রাজমন্ত্রীরা তাঁহাদের নিকট ভারতবর্ষের সন্ধান লইতেন।

তাঁহার আর দুইটী প্রধান কীর্ত্তির বিষয় এই স্থলেই লিখিত হইবে। তাহা এদেশের ইতর সাধারণ সকলেই অবগত আছেন। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল্ কমিটী, নিমতলার শবদাহ ঘাট স্থানান্তর করিবার প্রস্তাব করেন এবং তাঁহারা যে স্থানে ঐ ঘাট নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা সহর হইতে অনেক দূর,—দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী। সে স্থানে ঐ ঘাট হইলে, যথা সময়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনে সহরস্থ লোকের যার পর নাই ক্লেশ ও অসুবিধা হইবে, কমিটী তাহা বিবেচনা করেন নাই। দেশের অনেক লোকে এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রামগোপালকে ধরিলেন। হিন্দুরা; যথাবিহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাঘাতে ধর্ম্ম হানির আশঙ্কা করিয়াছিলেন। রামগোপাল নিজে ইহার জন্য ভীত হয়েন নাই। মৃত্যুর পর তাঁহার শব সমাহিতই হউক কিম্বা দগ্ধই হউক, তিনি তাহা কিছু ভাবিতেন না। কিন্তু দেশস্থ ব্যক্তিগণের জন্য দুঃখিত হইলেন। তিনি বাক্-পটুতারূপ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এ যুদ্ধেও জয়লাভ করিলেন। নিমতলার ঘাট, নিমতলায়ই রহিল।

ইহার পর হইতে রামগোপালের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। তিনি সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ও কাজ কর্ম্মের গোল

যোগ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বাসে উৎসুক হইলেন। ক্রমে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে সম্বাদ পাইলেন যে, ১২৭৩ সালের দুর্ভিক্ষে যে সকল অনাথ বালক বালিকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে পতিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে খৃষ্টান মিসনরিগণের শিক্ষাধীনে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুগণকে কহিলেন, "এই প্রস্তাবের একাংশ সদুদ্দেশ্য মূলক হইলেও ইহার মূল অবিশুদ্ধ। অতএব যেখানে এই প্রস্তাবের আন্দোলন হইতেছে তোমরা আমাকে সেইখানে লইয়া চল। আমি হয়ত এ নিয়ম রহিত করিতে পারিব।" এখন তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ, এজন্য বন্ধুগণ ও চিকিৎসকেরা তাদৃশ সাংঘাতিক সময়ে তাঁহাকে সেরূপ চেষ্টা ও সেরূপ চিন্তা হইতে বিরত করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি সম্বাদ পাইলেন, তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। এই সম্বাদ পাইয়া তিনি জীবনাশা এককালে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করিলেন। তিনি যে পর্য্যন্ত পীড়িত শয্যায় শয়ান ছিলেন, তাঁহাকে একদিনের নিমিত্তও কেহ মৃত্যু ভয়ে ভীত বা চঞ্চল দেখে নাই। কখন একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও কষ্টসূচক কোন শব্দ উচ্চারণ করেন নাই। মুমূর্ষু রামগোপাল যখন মৃত্যুর শেষ

যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, তখন একজন বন্ধু মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া রোদন আরম্ভ করেন। কিন্তু রামগোপাল বন্ধুর রোদন দেখিয়া তাৎকালীন মানসিক বল নষ্ট করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, এইজন্য মিষ্টভাষায় তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিতে বলেন। তিনি বন্ধুগণকে বলিলেন,—"আমি মরিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছি, সে জন্য আমার কিছুমাত্র ভয় নাই।" যে দিন (১২৭৫ সালে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই দিন প্রাতে তাঁহার দুই বাহু দেহ পার্শ্বে বিসারিত ছিল, যেন আপন মনে অস্ফুটস্বরে কি বলিতে ছিলেন,—বিকম্পিত অধরোষ্ঠ, তাহা প্রকাশ করিতেছিল। ক্রমশঃ উভয় পার্শ্ব হইতে হস্তদ্বয় বক্ষে আনিলেন,—পুটদ্বয় সংযুক্ত করিলেন। ইহা তাঁহার শেষ প্রার্থনা, অবস্থাই তাহার পরিচয় দিতে ছিল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া,—এই ভাবেই প্রাণত্যাগ করিলেন। এই, সেই গৌরবান্বিত পুরুষের গৌরবান্বিত মৃত্যু !

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি আপন সম্পত্তি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ সম্পত্তির পরিমাণ তিনলক্ষ টাকার অধিক। একলক্ষ টাকা তাঁহার বিধবা পত্নী ও অন্যান্য পরিবারদিগকে দেন। ২০,০০০ হাজার টাকা ডিসট্রিক্ট্ দাতব্য চিকিৎসালয়ে দেন, এবং ৪০,০০০ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন।

বন্ধুগণকে প্রায় ৪০,০০০ হাজার টাকা ধার দেওয়া ছিল, তাহা ছাড়িয়া দেন। তিনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতা আপনার পূজা ও ব্রতাদি জন্য যখন যত টাকা চাহিতেন, তখন তাহাই দিতেন। মাতাকে অসন্তুষ্ট করিবার জন্য আপন মতের বিরুদ্ধ কোন কাজ করিতেই পরাঙ্মুখ হইতেন না। তিনি নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন বলিয়া, ব্রাহ্মণেরা একবার তাঁহার মাতার নৈবেদ্য ফিরাইয়া দেন। ইহাতে জননী যারপর নাই, মনে ব্যথা পান। রামগোপাল তাহা জানিতে পারিয়া প্রত্যেক নৈবেদ্যের উপর ষোলটী করিয়া টাকা দিলেন। তখন রামগোপালকে বারম্বার আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নৈবেদ্য লইলেন। রামগোপালের জননী সন্তুষ্ট হইলেন।

রামগোপালের জীবন-চরিত সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণিত হইল। এখন তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে সাধারণতঃ কয়টী কথার উল্লেখ করিব। রামগোপাল লোক হিতৈষী, বিচারক্ষম, বহুদর্শী, শিক্ষানুরাগী, ন্যায়পরায়ণ, কুসংস্কার বিহীন, দয়ালু, ক্ষমাশীল, স্বাধীন প্রকৃতি, মিত্রানুরাগী ও সত্যবাদী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মনুষ্যোচিত আরও অনেক গুণ ছিল। তিনি পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত ছিলেন না, ইংরাজী ভাষায় তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। বিখ্যাত মাউয়েট সাহেব বলিতেন,—"রামগোপালের

পরবর্ত্তী বাঙ্গালীদিগের রামগোপালের অনুকরণ করা উচিত।” কখন তাঁহার উদ্দেশ্যের অসাধুতা প্রকাশ পায় নাই। কাহার সহিত ব্যবহারে কখন তিনি আপন ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নাই। তিনি অন্তরের সহিত স্বদেশকে ভাল বাসিতেন। লোক হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানই, তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তিনি বালক কালে, সতীর্থগণের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে একটী ভগ্ন স্তম্ভকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, “তুমি আমাকে ভাঙ্গিতে পরিবে, কিন্তু নোয়াতে পারিবে না।” তিনি যাবজ্জীবন যত কার্য্য করিয়াছিলেন, সকলের উপরই এই ভাবের ছায়া দৃষ্ট হইয়াছিল। এদেশে রেলওয়ে প্রচলিত করিবার জন্য তিনি তাহার অনুষ্ঠাতৃগণের সহিত সবিশেষ সহযোগিতা করিয়াছিলেন। মনুষ্যত্ব পুরস্কারে সকলেরই সমান সত্ব, ইহা দেখাইবার জন্য তিনি বিস্তর শ্রম করিয়া গিয়াছেন। স্বমতের পোষকতাহেতু তাঁহার নিকট সমাগত ব্যক্তিগণের সহিত একাসনে বসিতেন। স্বয়ং গমন করিয়া দূরস্থ বন্ধুগণের তত্ত্বাবধান করিতেন। বিখ্যাত মিউটিনির সময়ে বাঙ্গালীদিগের উপর গবর্ণমেণ্টের যে কুসংস্কার হইয়াছিল, তাহার দূরীকরণে রামগোপাল অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্যারিচাঁদ মিত্রকে পত্র

লিখিয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি, গবর্ণমেণ্টের যে যে সভা ও সমাজের নির্দ্দিষ্ট মেম্বর ছিলেন, সকলেই তাঁহার মৃত্যু জন্য শোক, সভার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন।

বিদ্যালয়ের বালকগণ,—"স্বনাম পুরুষোধন্য৷" এই প্রাচীন বাক্যের স্মরণ করিয়া রামগোপাল ঘোষকে ধন্যবাদ দেও।

কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

ইনি, ১২২২ সালে (১৮১৫খৃঃ) নদীয়া জিলার অন্তর্গত বিল্লগ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। পুত্র কন্যায় তাঁহার পাঁচ সন্তান, তন্মধ্যে মদনমোহন জ্যেষ্ঠ। রামধন সংস্কৃত কালেজের গ্রন্থলেখকের কার্য্য করিতেন। রামধনের পর তাঁহার কনিষ্ঠ রামরত্ন ঐ কার্য্য প্রাপ্ত হন। তিনি মদনকে কলিকাতা লইয়া গিয়া সংস্কৃত কালেজে পাঠার্থ নিযুক্ত করিয়া দেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর। মদন ইহার পূর্ব্বে স্বগ্রামস্থ কোন পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কিছু দিন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার উদরাময় হইল। বাড়ী চলিয়া গেলেন। প্রায় তিন চারি বৎসর দেশীয় অধ্যাপকগণের টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়িলেন। পরে ১২৩৬ সালে পুনরায় সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ বৎসর সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কালেজে প্রথম প্রবিষ্ট হন। তখন তাঁহার বয়স দশ বৎসর। মদনের সঙ্গে এক

শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের অত্যন্ত প্রণয় হইল। বুদ্ধি বিষয়ে কেহই কম ছিলেন না। পরীক্ষায় দুই জনেই উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইতেন। সে শ্রেণীতে পারিতোষিক হইলে তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ পাইতেন না। তিনবৎসরে ব্যাকরণ পাঠ সম্পন্ন করিয়া উভয়েই সাহিত্য শ্রেণীতে উঠেন। এই শ্রেণীতে কিছু দিন পড়িতে পড়িতেই মদনমোহন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কবিতা গুলি সরল ও মিষ্ট হইত এবং তিনি পাঠ্য পুস্তক সকল উত্তমরূপে বুঝিতেন। এই জন্য তৎকালীন সাহিত্যাধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহাকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। দুই বৎসর সাহিত্য শ্রেণীতে পড়িয়া অলঙ্কার শাস্ত্রের শ্রেণীতে উঠিলেন। তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর। তিনি অতি সত্বরই অলঙ্কারে ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। বিশেষতঃ পদ্য গ্রন্থনে ক্রমেই তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তি বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ এই শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও মদনমোহনের শিক্ষানৈপুণ্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। মদনমোহন, এই শ্রেণীতে পড়িবার সময় সংস্কৃত "রস-তরঙ্গিনী' গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। তাঁহার ঐ বাঙ্গালা কবিতা গুলি অতি মিষ্ট ও সুললিত ; কিন্তু বালকগণের পাঠ্য পুস্তকে তুলিয়া দিবার যোগ্য নহে।

কাব্য শাস্ত্রে অনুরাগ দেখিয়া এই সময়ে তাঁহার অধ্যাপকেরা তাঁহাকে "কাব্যরত্নাকর" এই উপাধি দেন। কিন্তু কোন্ সময়ে কি কারণে তাঁহার "তর্কালঙ্কার" উপাধি হয়, জানা যায় না।

দুই বৎসর অলঙ্কার পড়িয়া কিছু কাল জ্যোতিষ ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করেন। ইহার পর স্মৃতির শ্রেণীতে পাঠারম্ভ করেন। তিন বৎসর কাল এই শ্রেণীতে পড়িয়া স্মৃতির পরীক্ষা দেন। ঐ পরীক্ষায় এক শত একুশ প্রশ্ন প্রদত্ত হয়, তন্মধ্যে মদনমোহন আটচল্লিশটী প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়াছিলেন। তদপেক্ষা অধিক আর কেহই লিখিতে পারেন নাই। ঐ পরীক্ষায় তিনি এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসাপত্র লাভ করেন। মদনমোহন স্মৃতির শ্রেণীতে পড়িবার সময় "বাসবদত্তা" নামক এক খানি বাঙ্গালা কাব্য পদ্যে প্রণয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম একুশ বৎসর মাত্র। ইহা সংস্কৃত "বাসবদত্তার" গল্প লইয়া লিখিত হয়। যশোহর জিলার অন্তর্গত নওয়াপাড়ার জমিদার কালীকান্ত রায়ের প্রবর্ত্তনায় ১২৪৪ সালে উহা রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, "রসতরঙ্গিনী" ইহার পরের রচিত। কথিত আছে, বাঙ্গালা কবিতা রচনা বিষয়ে ভারতচন্দ্রকে পরাজিত করিবার বাসনায় তিনি "বাসবদত্তা" রচনা করেন। কিন্তু পরি-

শেষে উভয় রচনার তুলনা করিয়া দেখিলেন যে, তার তকে হারাইতে পারেন নাই। তদবধি বাঙ্গালা কবিতা লেখা প্রায় ছাড়িয়া দেন। বোধ হয়, এরূপ ক্ষণিক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কবিতা গ্রন্থনে নিবৃত্ত না হইলে, তিনি ভবিষ্যতে উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। যেহেতু বাল্যকালেই তাঁহার ঐ শক্তির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। যাহা হউক ১২৫০ সালে (১৮৪২ খৃঃ) তিনি পাঠ সাঙ্গ করিয়া কালেজ ছাড়িলেন।

কালেজ ছাড়িয়া প্রথমে তিনি কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালায় ১৫৲ টাকা বেতনে পণ্ডিত হয়েন। পরে বারাসতের গবর্ণমেণ্ট ট্রেবর্ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদে ২৫৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তথায় এক বৎসর মাত্র কাজ করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজের অধ্যাপকের পদ পাইলেন। এই পদের বেতন ৪০৲ টাকা ছিল। তথায় দুই বৎসর প্রশংসার সহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহেবছাত্রেরা তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। যে সকল সিবিলিয়ান্ সাহেব এদেশে কর্ম্ম করিতে আসেন, তাঁহারা ঐ কালেজে বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগর কালেজ স্থাপিত হয়। তর্কালঙ্কার ৫০৲ টাকা বেতনে তাহার প্রধান পণ্ডিতের পদ পান। ঐ পদে এক বৎসর মাত্র কর্ম্ম করিয়া সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপকের পদে ৯০৲ টাকা

বেতনে নিযুক্ত হইলেন। এত দিনে তাঁহার গুণের গৌরব ও পরিশ্রমের কিয়ৎ পুরস্কার হইল। তিনি উৎসাহ ও আনন্দের সহিত অধ্যাপনা কার্য্য করিতে লাগিলেন। ছাত্র ও উপরিতন কর্ম্মচারীরা তাঁহার কাজে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তিন বৎসর সংস্কৃত কালেজের কর্ম্ম করেন।

এই সময়ে মহামান্য ড্রিঙ্ক্‌ওয়াটার বেথুন সাহেব এ দেশীয় স্ত্রীগণকে শিক্ষাদিবার জন্য এ দেশীয় প্রধান প্রধান সুশিক্ষিতগণের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে ছিলেন। মদনমোহনও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অনেক পরিশ্রম করেন। মদনমোহনের চরিতাখ্যায়ক বলেন, যে দিন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তি সংস্থাপিত হয় সেই দিন মদনমোহন তথায় উপস্থিত থাকিয়া ভূমিতে নবরত্ন নিহিত করেন এবং তখন বিদ্যালয়ে কেহ বালিকা প্রেরণে সম্মত হন নাই, কিন্তু তর্কালঙ্কার সব প্রথমে আপনার দুই কন্যা পাঠাইয়া পথ প্রদর্শক হইয়াছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং জজ্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত পরে আপন আপন কন্যা বিদ্যালয়ে পাঠান। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার ভার তাঁহার উপরই অর্পিত হইয়াছিল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেন। তখন নীতিকথা ও শিশুবোধকাদি কয়খানি পুস্তকই বালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তক ছিল। মদনমোহন বালিকা-

দিগের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূরীকরণার্থ ১২৫৭ সালে (১৮৪৯ খৃঃ) তিন খণ্ড শিশুশিক্ষা রচনা করেন। অনেকেই স্বীকার করেন যে, শিশুশিক্ষার পূর্ব্বে বালক বালিকার পাঠোপযোগী তাদৃশ সরল বাঙ্গালা আর লিখিত হয় নাই। প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা তিনি বেথুন সাহেবের নামে উৎসর্গ করেন। এই সময়ে কলিকাতার সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্র তাঁহারই যত্নে স্থাপিত হয়। তাহাতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের অনেক প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। "সর্ব্ব শুভকরী" নাম্নী এক খানি বাঙ্গালা সম্বাদ পত্রিকা তাঁহার যত্নে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি নিয়মিতরূপে উহাতে প্রস্তাব সকল লিখিতেন। স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে তিনি অনেক প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। তৎকালে সকলেই তাঁহার ঐ সকল লেখার প্রশংসা করিতেন। তিনি "কন্যাপ্যেবং পাল-নীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" মহা' নির্ব্বাণ তন্ত্রের এই বচন উদ্ধৃত করিয়া লোকদিগকে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উৎ-সাহিত করিতেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অন্তরের সহিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন বলিয়া বেথুন সাহেব তাঁহার পুরস্কার করিতে ইচ্ছা করিলেন। মদনমোহনের নিকট এই ভাব প্রকাশ করায় তিনি এই অভিপ্রায়ে উত্তর করিয়াছিলেন, "আপনি অপার সমুদ্র পার হইতে আসিয়া বঙ্গবালা-

গণের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা করিতেছেন, আমি বাঙ্গালী হইয়া সেই চেষ্টার কিঞ্চিৎমাত্র সহায়তা করিয়া কোন ক্রমেই পুরস্কার পাইবার যোগ্য নহি।” বেথুন ইহাতে অধিকতর সন্তুষ্ট হন। সাহেব প্রথমে তর্কালঙ্কারকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান নিবন্ধন বেতন লইতে অনুরোধ করেন, মদন তাহা অস্বীকার করিয়া ঐ পদে গিরীশ বিদ্যারত্নকে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে সংস্কৃত-কালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। বেথুন তর্কালঙ্কারকে ঐপদ দিতে চাহেন। তর্কালঙ্কার, আপনাপেক্ষা বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের অধিক যোগ্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে ঐ পদ দিতে অনুরোধ করেন। তর্কালঙ্কারের চরিতাখ্যায়ক এই কথার সত্যতায় সংশয় করেন। তিনি বলেন “ইহা সত্য হইলে তর্কালঙ্কার বন্ধুত্ব ও ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।”

কলিকাতার জল বায়ু তর্কালঙ্কারের সহ্য হইত না। তিনি যত কাল কলিকাতায় ছিলেন, বরাবর অস্বাস্থ্য ভোগ করিতেন। ক্রমে তাঁহার অস্বাস্থ্য বদ্ধ-মূল হইতে লাগিল। এই সময়ে মুরসিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদ শূন্য হওয়ায় তিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইবার জন্য বেথুন সাহেবকে বলেন। বেথুন তর্কালঙ্কারের কুশলার্থী ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা গবর্নমেণ্টকে এজন্য বিশেষ রূপে অনুরোধ করায় তর্কালঙ্কার ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন।

ঐ পদের বেতন মাসে ১৫০ টাকা ছিল। গ্রন্থ ও সম্বাদপত্র প্রচার, স্ত্রী শিক্ষার সহায়তা এবং উৎকৃষ্ট স্বভাব প্রযুক্ত ইহার পূর্ব্ব হইতে দেশমধ্যে তাঁহার সুখ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল। মুরসিদাবাদে গিয়া তত্রত্য ব্যক্তিগণ দ্বারা তিনি সমাদরে ও পরিচিত বন্ধুর ন্যায় পরিগৃহীত হইলেন। ছয়বৎসর জজপণ্ডিতের কাজ করিয়া ঐ স্থানেই ডেপুটী মাজিষ্টরের পদ পান। বিদ্যা, বুদ্ধি ও সরল ব্যবহারে তত্রত্য সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। জজ পণ্ডিতের কর্ম্ম করিবার সময় তাঁহার যথেষ্ট অবসর ছিল। এইজন্য মুরসিদাবাদের হিতের জন্য অনেক সদনুষ্ঠানে মনোযোগ করিতে পারিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে সভাস্থাপন ও তাহাতে বক্তৃতা করিয়া লোকদিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি দিতেন। বিধবা ও অনাথ বালক বালিকাদিগের সাহায্য জন্য একটী দাতব্যসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত মুরসিদাবাদে একটী অতিথিশালা স্থাপন করেন। মদনমোহনের যাইবার পূর্ব্বে মুরসিদাবাদে এতাদৃশ সাধারণ হিতকর কাজের অনুষ্ঠান প্রায় ছিল না।

মদনমোহন জজ পণ্ডিতের পদ ত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঐ পদে নিযুক্ত হন। ১২৬২ সালে (১৮৫৫ খৃঃ) শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের "বিধবা বিবাহ বিষয়ক" প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। দেশীয় পণ্ডিত

গণ, হিন্দু আঢ্যগণের সাহায্যে ঐ পুস্তকের উপর অনেক আপত্তি উত্থাপিত করিয়া কতকগুলি পুস্তক বাহির করিলেন। বিদ্যাসাগরও প্রচুর পরিমাণে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, যুক্তি ও বিচারশক্তি দ্বারা ঐ সকল আপত্তির খণ্ডন করিয়া তিন চারিশত পৃষ্ঠা পরিমিত "বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক" এই নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিলেন। উহার উত্তর দানে কেহ সমর্থ হইলেন না। সুতরাং প্রায় সকলকেই বিশ্বাস করিতে হইল যে, বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির উদ্যোগে বিদ্যাসাগর কলিকাতার ব্যবস্থাপক সভা হইতে পর বৎসর এক আইন পাস করাইলেন। উহার মর্ম্ম এই, বিধবার গর্ভজাত পুত্রগণ পৈতৃকধনের অধিকারী হইবে। ঐ আইনকে ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন কহে। উপরি উক্ত জজ পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই নূতন নিয়মানুসারে ১২৬৩ সালের ২৩এ অগ্রহায়ণ সব প্রথম বিধবা বিবাহ করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারই এই বিবাহের ঘটক ছিলেন। দেশাচার বিরুদ্ধ স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহে সহায়তা করায় মদনমোহনের উপর গ্রামস্থ লোকেরা খড়্গ-হস্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই অপরাধে গ্রাম মধ্যে আট নয় বৎসর সমাজচ্যুত হইয়া ছিলেন। তদ্ব্যতীত এজন্য তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ ভোগ

করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বিপক্ষেরা যাহাই বলুন, এস্থলে মোটের উপর আমরা এই কথা বলিতে পারি, কোনরূপ অনিষ্টকর প্রথার নিরাকরণ বা নূতন বিধ মঙ্গলানুষ্ঠান করিতে গিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিলে—সে বিড়ম্বনায় মনুষ্য জীবনের গৌরব বৃদ্ধি হয়।

মুরসিদাবাদে অবস্থিতি কালে তর্কালঙ্কার বেথুন্ সাহেবের মৃত্যু সম্বাদ পান। এই সম্বাদে তিনি শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। কারণ বেথুনের সহিত তাঁহার একটু আন্তরিক সম্বন্ধ ছিল। সাহেব ও বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায় সেরূপ থাকে না। তর্কালঙ্কারের কন্যাদ্বয়কে বালিকা কালে বেথুন্ কোলে করিয়া আপনার বাড়ী লইয়া যাইতেন। অনন্তর তিনি কান্দীর সব্‌ডিবিসন্ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার জন্যই ঐ সব ডিবিসন্ স্থাপিত হয়। তিনি কান্দীর অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। বালক বালিকার বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা, পথ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বিস্তর শ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ডেপুটী মাজিষ্টার ভাবে এসকল করিতে বাধ্য ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি কার্য্যের দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে, লোকের ভাল করিবার ইচ্ছা তাঁহার অন্তরে ছিল। কিছুদিনের পর শুনিলেন, তাঁহার মহকুমার মধ্যে "মাকালতোড়" নামক স্থানে কোন বিশেষ পর্ব্বো-

হোপলক্ষে দুইজন দুর্দ্দান্ত মুসলমান জমিদারের মধ্যে বৎসর বৎসর ভয়ানক দাঙ্গা হয়। ঐ দাঙ্গায় অনেক লোক হতাহত হইয়া থাকে। ইহাও শুনিলেন, একবার একজন সাহেব মাজিষ্টর দাঙ্গা নিবারণ করিতে গিয়া হত হইয়াছিলেন। তিনি শান্তিরক্ষক,—নিজ মহকুমার শান্তি রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য, ইহা তর্কালঙ্কারের মনে সতত জাগরূক থাকিত। এই কর্ত্তব্য বুদ্ধির উত্তেজনায় তিনি একবার ঐ দাঙ্গা নিবারণার্থ অশ্বারোহণে মাকালতোড়ে স্বয়ং উপস্থিত হন। বিবাদকারিগণ তাঁহাকে আক্রমণ করে। অশ্ব আহত হইয়া ভূপতিত হয়। তিনিও সেই সঙ্গে ভূমিতলে নিপতিত হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন। একজন প্রভু পরায়ণ ভৃত্য সে যাত্রায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে। কয়েক জন পুলিস্ সৈন্য সঙ্গে যায়; কিন্তু তাহারা প্রচুর পরিমাণে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া "তফাৎ" ছিল।

কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার মাকালতোড়ে গিয়া কয়েক জন অপরাধী ধরিয়া আনেন এবং তাহাদের যথাযোগ্য শাস্তি দেন। কিন্তু তাহারা জমিদার, সকল লোকই তাহাদের বশীভূত, এইজন্য উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাহারা উচ্চ আদালত হইতে নিষ্কৃতি পায়। এই ঘটনায় মদনমোহন নিতান্ত ভগ্ন-হৃদয় হইয়া পড়েন এবং দুর্ব্বৃত্ত জমিদারগণকে শত্রু করিয়া তাঁহার অত্যন্ত

ভয়ও হইয়াছিল। সর্ব্বদা প্রাণভয়ে শঙ্কিত থাকিতেন। যে দিন তাহাদের নিষ্কৃতির সম্বাদ পান, সেই দিন বলিয়াছিলেন,—"আজ আমার অর্দ্ধমৃত্যু হইল।" তিনি এই সময় হইতে কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। নানা কারণে প্রকৃতরূপে শান্তিরক্ষা করিবার যো নাই, তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল। এই জন্য তিনি কর্ম্ম ছাড়িয়া কবিতা রচনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার সংকল্প করেন। কিন্তু এ সকল সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে কান্দীতে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তিনি ঐ রোগে ১২৬৪ সালের (১৮৩৭ খৃঃ) ২৭ ফাল্গুন প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা পত্নী ও অনেক গুলি পুত্রকন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার অভাগিনী জননী এতাদৃশ পুত্র যমের মুখে দিয়া আজও জীবিতা আছেন। তাঁহার পাঁচ কন্যা বর্ত্তমান। কন্যাগণের মধ্যে কেহ কেহ লেখা পড়া জানেন ও কবিতা লিখিতে পারেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহার পত্নীকে সম্বোধন করিয়া এই কয়টী কথা বলিয়াছিলেন,—"তুমি কেঁদনা, তোমার চিরসহচর তোমায় ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার প্রাণসখা ঈশ্বর * তোমার

---

* শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া।

নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দিবে। তাঁহার জীবদ্দশায় তুমি ও আমার প্রাণসমা কন্যাগণ কোন কষ্ট পাইবে না। * * আমি তোমাদের নিকট এই ভিক্ষা চাই, যেন প্রশান্তভাবে মরিতে পাই,—মৃত্যুর পূর্ব্বে যেন আমায় শয্যা হইতে নামান না হয়।

মদনমোহন অনেক গুলি সংস্কৃত গ্রন্থের সংশোধন ও মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। যখন এ দেশে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার তত প্রচলন ছিল না, তখন তিনি গদ্য ও পদ্যে উৎকৃষ্ট রচনা শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষাতেও অনেক সুমধুর ও সুললিত কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত কবিতার অনেক পদ, জয়দেবের "মধুর-কোমল-কান্তপদাবলীর" সদৃশ। কি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা উভয়বিধ কবিতার অনেক ছন্দ, রাগরাগিণী ও তালের সহিত সুসঙ্গত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি এত অধিক ছন্দের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয়, বাঙ্গালা কবির মধ্যে কেহই তদ্বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ নহে। অথচ ঐ সকল ছন্দই বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট। সুললিত পদ বিন্যাস ও ছন্দবন্ধ বিষয়ে তাঁহার যাদৃশী ক্ষমতা ছিল, প্রকৃত কবিত্ব প্রকাশে সেরূপ ছিল না। শুনা যায়, তিনি আর এক-খানি বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাহার পাণ্ডুলিপি অপহৃত হয়। তিনি বঙ্গকামিনীগণের জন্য

অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন। এখনকার বাঙ্গালা রচনার মধ্যে কথায় কথায় "উন্নতিসোপানে পদবিক্ষেপ" এইরূপ শব্দ বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। মদনমোহনের জীবন চরিত পড়িলে ঐ কথার অর্থ বুঝা যায়। তিনি বাঙ্গালা স্কুলের পাণ্ডিত্যরূপ নীচের ধাপ হইতে প্রতি ধাপ স্পর্শ পূর্ব্বক উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে উৎসাহ, হিতৈষা, সরলতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তেজস্বিতা, ইত্যাদি গুণ গুলি স্পষ্ট দৃষ্ট হইত।

জজ্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত।

ইনি, কলিকাতা মহানগরীতে ১২২৬ সালে (১৮২০ খৃঃ) ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম শিবনাথ পণ্ডিত। ইহাঁদিগের পূর্ব্ব নিবাস কাশ্মীর দেশে। শিবনাথের তাদৃশ সঙ্গতি ও সম্ভ্রম ছিল না, কিন্তু তিনি অতি সৎস্বভাব লোক ছিলেন। কলিকাতার অনেকের সহিত তাঁহার বাস্তবিক সদ্ভাব ছিল, তিনি কৌতুক জনক গল্পাদি দ্বারা বালক ও যুবগণের সহিত আমোদ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। আলিপুরের দেওয়ানী আদালতে অতি সামান্য বেতনে মহাফেজের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

শম্ভুনাথ প্রথমে শিক্ষার্থ গৌরমোহন আঢ্যের ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তিনি পাঠাবস্থায় সহাধ্যায়ীগণের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন না; কিন্তু শিক্ষাবিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা করিতেন। ভাল ভাল পুস্তক গৃহে বসিয়া অভিজ্ঞ লোকের সাহায্যে রীতিমত অধ্যয়ন করিতেন। সহাধ্যায়ী ও ভিন্ন বিদ্যালয়স্থ উত্তম উত্তম ছাত্রদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সভা স্থাপন করিতেন এবং যাহাতে মান-

সিক উন্নতি হয় তদনুরূপ নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন। পরম বন্ধু ভবানী প্রসাদ দত্তের সহিত একত্রে বেকনের বিখ্যাত প্রবন্ধ সকলের টীকা করিয়া প্রচার করেন। উহা দ্বারা এখনকার ছাত্রেরা অনেক সাহায্য পাইতেছেন। সরলতা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ, তাঁহার চরিত্রে অধিক পরিমাণে দেখা যাইত। এইজন্য তিনি, সমপাঠী কি ভিন্ন বিদ্যালয়স্থ বালকগণেরও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কোন বালকের কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতিবিধানার্থ সবিশেষ যত্ন করিতেন। এমন স্থলে ঐ বিপদাপন্ন বালকের পক্ষতা অবলম্বন করিয়া সময়ে সময়ে প্রচুর সাহস প্রকাশ করিতেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের পড়া ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে কর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে হইল। তিনি প্রথমে মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে মহাফেজের সহকারী নিযুক্ত হন। পরে ১২৫২ খৃষ্টাব্দে তত্রত্য জজ্ সর রবর্ট বারলো সাহেব তাঁহার যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী অপেক্ষাকৃত উন্নত পদে অর্থাৎ ডিক্রী জারির মোহরের করিয়া নিযুক্ত করিলেন। তিনি ঐ পদে কার্য্য করিতে করিতে ডিক্রী জারির আইন সম্বন্ধে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিলেন। উহাতে ঐ আইনের কতকগুলি দোষের সুন্দর বিচার করা হয়। ঐ পুস্তক খানি কার্য্যোপযোগী ও উৎকৃষ্ট হওয়ায়, তিনি সুখ্যাতির

সহিত গবর্ণমেণ্টে পরিচিত হইলেন। উহা দ্বারাই ভবিষ্যতে ঐ আইনের দোষ সংশোধন হয়। বারলো সাহেব নিজে অত্যন্ত দুষ্ট ও নিষ্ঠুর ছিলেন। অনেককেই তাঁহার এই স্বভাব দোষের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি শম্ভুনাথকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। শম্ভুনাথের ঐ উৎকৃষ্ট পুস্তকের বিশেষ গৌরব করিতেন এবং তাঁহার নিকট শিক্ষিত তাঁহারই একজন আমলা দ্বারা উহা প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া তিনি আপনারও গৌরব জ্ঞান করিতেন।

এই সময়ে ঐ আদালতে মিসিলখাঁর পদ শূন্য হওয়ায় শম্ভুনাথ উহা পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। এ কর্ম্ম অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ছিল, এইজন্য বারলো সাহেব তাঁহাকে উহার প্রার্থনা করিতে নিষেধ করেন; যেহেতু তিনি জানিতেন যে, শম্ভুনাথের শ্বাস রোগ হইবার সম্ভাবনা ছিল। তদনুসারে তিনি ঐ প্রার্থনা হইতে বিরত হইয়া কোন বন্ধুর পরামর্শে ওকালতী কর্ম্মারম্ভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১২৫৬ সালে ওকালতী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। উপরিউক্ত পদ প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হওয়াই, তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির নিদান।

মোকদ্দমা পাইলে তিনি অত্যন্ত শ্রম ও অভিনিবেশ সহকারে তাহার অবস্থানুসন্ধান করিতেন এবং সুতীক্ষ্ণ

বুদ্ধি প্রভাবে তৎসম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল অতি সহজে বুঝিয়া তাহাতে আবশ্যকমত তর্ক বিতর্ক করিতে পারিতেন। জানিয়া শুনিয়া একবর্ণ মিথ্যা কহিতেন না, কাহার মোকদ্দমার কোন অংশে কিঞ্চিৎ মাত্র অন্যায় আছে জানিতে পারিলে উহা কদাচ গ্রহণ করিতেন না। অসঙ্গতি নিবন্ধন কাহাকে অত্যাচারের প্রতিকারে অসমর্থ দেখিলে তিনি বিনা অর্থ গ্রহণে তাহার মোকদ্দমা করিয়া দিতেন। এমন স্থলে কখন কখন ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির ব্যয়ও স্বয়ং প্রদান করিতেন। মোকদ্দমা সকলের বাস্তবিক যেরূপ নিষ্পত্তি হইবার সম্ভাবনা, অর্থী প্রত্যর্থীর অপ্রিয় হইলেও তাহাই বলিতেন, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত করিবার জন্য কখন তাহার অন্যথা করিতেন না। এই সকল কারণে তিনি অতি শীঘ্রই একজন সত্য ও ন্যায়পরায়ণ, কার্য্যদক্ষ এবং দয়াবান্ উকিল বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও আদৃত হইয়া উঠিলেন। এইরূপ আচরণে যদিও তাঁহার আয়ের অল্পতা হইতে লাগিল, কিন্তু বিশুদ্ধ ব্যবহার গুণে সকল শ্রেণীস্থ লোকেরই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং তজ্জন্য এত অধিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে উকিল মোক্তারের ভাগ্যে সেরূপ প্রায় ঘটে না। তাঁহার ব্যবহারজ্ঞতা দর্শনে কখন কখন সাহেবরাও বিস্মিত হইতেন। যাহাহউক,

বিচারপতি জে, আর, কলভীন সাহেব, তাঁহার কার্য্য-দক্ষতা ও সুশীলতায় এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বিনা প্রার্থনায় তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট জুনিয়ার উকিলের পদ প্রদান করেন। ১২৬০ সালে ঐ পদ পান।

যদিও এই পদটী অত্যন্ত সম্ভ্রমজনক বটে, কিন্তু ইহাতে একটী কঠিন কার্য্য ছিল। যে সকল অপরাধী সেসন্ আদালত হইতে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সদর নিজামতে আসিত, ঐ উকিলদিগকে গবর্ণ-মেণ্টের পক্ষ হইয়া অপরাধীর বিপক্ষে তর্ক করিতে হইত। গবর্ণমেণ্টের জুনিয়ার উকিলদিগের মনে তর্ক করিবার সময় কখন কখন এমন হেতুবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে, যাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে অপরাধীর পক্ষ সমর্থিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বেতন ভোগী সুতরাং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারেন না। শম্ভুনাথের মনে একবার ঐরূপ হেতুবাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টের পদ ত্যাগ করিয়া অপরাধীর স্বপক্ষে বক্তৃতা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। ঐ সকল মোকদ্দমায় তিনি নিতান্ত অসুখী হইতেন। পরে এরূপ মোকদ্দমায় প্রায়ই উপস্থিত হইতেন না।

১২৬৯ সালে (১৮৬১ খৃঃ) তিনি গবর্ণমেণ্টের সিনি-য়র অর্থাৎ প্রধান উকিলের পদ প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে

এই পদে রমাপ্রসাদ রায় ছিলেন। শম্ভুনাথ আইনের কূটার্থ সম্বন্ধে বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়া শ্রোতৃগণকে বিরক্ত করিতেন না। আইনের উদ্দেশ্য সদ্বিচার ও সংযুক্তির সাধারণ নিয়মের উপর সরল ও সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিতেন। এই জন্য তাঁহার বক্তৃতার কোন অংশই কখন কাহার অপ্রিয় বা বিরক্তিকর হয় নাই। বিশেষতঃ ফৌজদারী আইনে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ঐ আইনের সূক্ষ্ম তর্কে তাঁহাকে কেহই পারিয়া উঠিতেন না। তাঁহার আইনের অভিজ্ঞতা গবর্ণমেণ্ট এমন উত্তম রূপে বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ১২৬৫ সালে কলিকাতাস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি উত্তমরূপে দুই বৎসর কাল এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ১২৬৯ সালে যখন কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে হাইকোর্ট নামক উচ্চতম আদালত স্থাপিত হয়, তখন ঐ আদালতে একজন এতদ্দেশীয় বিচারপতি নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত হইলে বিখ্যাত রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ঐ পদে মনোনীত হন; কিন্তু বিচারাসনে উপবেশনের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় শম্ভুনাথই ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই উন্নত পদে নিযুক্ত হওয়াতে দেশীয় বিদেশীয় সকলেই প্রীতি হইয়াছিলেন।

যে কএক বৎসর তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে কখনই তাঁহার সদ্বিচার ও পাণ্ডিত্যে কাহারও সংশয় উপস্থিত হয় নাই। বরং অনেক সময়ে তিনি আত্মকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার বুদ্ধির আশ্চর্য্য তীক্ষ্ণতায় মিথ্যা মোকদ্দমা মাত্রেরই কুটিলতা প্রকাশিত হইয়া পড়িত। কোন মিথ্যা মোকদ্দমা তাঁহার এজলাসে উপস্থিত হইলে তৎপক্ষীয় উকিল মোক্তারগণ বিপদ আশঙ্কা করিতেন। তিনি দেশীয় উকিলগণের মুরব্বী স্বরূপ ছিলেন। কেহ কোন বিপদে পড়িলে পদ-ক্ষমতায় সাহায্য করিয়া কিম্বা বন্ধুভাবে পরামর্শ দিয়া যে কোন-রূপে তাঁহাকে উদ্ধার করিতেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালী বারিষ্টারদিগকে ন্যায্য স্বত্ব দান সম্বন্ধে মহা গোল-যোগ উপস্থিত হয়। কেবল শম্ভুনাথ ও কয়েক জন ভদ্র জজের যত্নে সে গোল মিটিয়া যায়। ইউরোপীয় সহযোগী বিচারপতি ও বারিষ্টারগণের সহিতও পরম সৌহৃদ্য ছিল। তিনি সদ্বিচার সম্পাদনে যেমন যত্নবান্ ছিলেন, লোকের সহিত শিষ্টাচার রক্ষায়ও তদনুরূপ ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ কৃতকার্য্যতায় এ দেশের একটী মহৎ উপকার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে শাসনকর্ত্তৃগণের এইরূপ সংস্কার ছিল যে, এ দেশীয়

লোকেরা উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য নহেন। কিন্তু শম্ভুনাথ সে কুসংস্কার দূর করিয়াছেন। তিনি কেবল আপনার বুদ্ধিশক্তি ও উদ্যোগিতায় তাদৃশ সামান্য অবস্থা হইতে এত উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। সুশিক্ষালাভের চেষ্টা অনেকেই করেন; কিন্তু গভীর জ্ঞানার্জ্জনে এবং কাজের লোক হইবার জন্য শম্ভুনাথ যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। তিনি প্রথমাবস্থায় স্কুলের পড়া ভিন্ন বাড়ীতে যত কাজ করিতেন, তাহার কতক পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তদ্ব্যতিরেকে, আইনে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এক সভা ছিল, শম্ভুনাথ ঐ সভার একজন প্রধান মেম্বর ছিলেন। নিয়মিতরূপে তাহাতে বক্তৃতা, বিচার ও তর্ক বিতর্ক করিতেন। কোন বিষয় পড়িয়া যাওয়াপেক্ষা লিখিতে গেলে অধিক চিন্তার প্রয়োজন, লেখা দ্বারা সুন্দররূপে তদ্বিষয়ের আলোচনা হয়। বোধ হয়, শম্ভুনাথ এই জন্য আইনসংক্রান্ত অনেক প্রস্তাব লিখিয়া তৎকালীন হিন্দুপেটরিয়টে প্রচার করিতেন। তাঁহার ঐ সকল প্রস্তাব-পাঠে উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ লোক প্রশংসা করিতেন। কোন বীজ আকাশে অঙ্কুরিত হয় না,—উপযুক্ত উপকরণের অপেক্ষা করে। শম্ভুনাথ উপযুক্ত উপকরণে সজ্জিত-

হইয়াই হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন।

যাহা হউক শম্ভুনাথ যখন এইরূপ সম্ভ্রম, সুখ্যাতি ও সদ্বিবেচনা সহকারে এ দেশীয় অত্যুচ্চ আদালতে সদ্বিচার সম্পাদন দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে-ছিলেন এবং স্বদেশীয়গণের উন্নতি আশা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সামান্য জ্বর ও একটী বিস্ফোটক হইল। ক্রমাগত তিন সপ্তাহ শয্যা-গত থাকিয়া ১২৭৪ সালের (১৮৬৭ খৃঃ) ২৪ জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশীয় ও বিদেশীয় জনগণ কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ, তৎকালীন কোন সম্বাদপত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করা অবধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার বাটীতে অষ্ট প্রহরই শোকার্ত্ত বন্ধুর মহাজনতা হইয়াছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পরেই যখন পরিজন ও পরমাত্মীয়েরা মৃত দেহের চতুষ্পার্শ্বে হাহাকার রবে বক্ষে করাঘাত করিতেছে অথবা ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে, যখন শতশত আত্মীয় স্বজন বাটীর ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র 'কি হলো! কি! সর্ব্বনাশ!' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছে এবং নয়নজলে সকলের বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে, যখন ভবানী-

পুর ও কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে গলিতে গলিতে 'কি দুঃখের বিষয়! কি দুরদৃষ্ট! দেশের কি দুর্ভাগ্য!' এইরূপ শব্দ, সকলের মুখ হইতে বিনির্গত হইতেছে, তখন বঙ্গদেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারাসনদ্বয়ে বিচারপতি-রাও আন্তরিক শোক ও আক্ষেপ প্রকাশ করিতে-ছিলেন। হাইকোর্টের অরিজিনাল সাইডে প্রধান বিচারপতি সর বার্নস পিকক্ এড্ভোকেট্ জেনেরলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই বিচারালয়ের অন্যতম সুপণ্ডিত বিচারকর্ত্তা জষ্টিস্ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যু সম্বাদ উকীল কৌন্সলী এবং সাধারণকে অবগত করিতে হইল। এই শোচনীয় ঘটনা অদ্য প্রাতে ঘটিয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজ্ঞী কর্তৃক হাই-কোর্টের বিচারকর্ত্তার পদে এদেশীয়দিগের মধ্যে ইনিই অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমার নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, আমাকে যথার্থই বলিতে হইবে, এবং বোধ হয়, ইহাতে কেবল আমার নহে, আমার সুপণ্ডিত সহযোগিদিগের মত ব্যক্ত করা হইতেছে যে, জষ্টিস্ শম্ভুনাথের মৃত্যুতে আমরা একজন বহুগুণ-বিশিষ্ট; মহামান্য বন্ধু ও সহযোগী হারাইয়াছি, এবং জন সাধারণ ও এই বিচারালয় একজন অত্যন্ত ন্যায়-বান, সুপণ্ডিত ও স্বাধীনহৃদয় বিচারপতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই।"

এ দিকে সদরদেওয়ানী আদালতে বিচারপতি জ্যাক্সন্ শম্ভুনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকারে আদালতকে সম্বোধন করিয়া ছিলেন ;—

"অদ্যকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যিনি এদেশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এই বিচারালয়ের বিচারপতি পদে, মহারাজ্ঞী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু-সম্বাদের উল্লেখ করা আবশ্যক। আমাদিগের মৃতসহযোগী ও বন্ধুর সহিত এই আদালতের অনেক উকিল কৌনসলির, আমার অপেক্ষা অধিককাল পর্য্যন্ত এবং অধিকতর অন্তরঙ্গতা ছিল সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তাঁহার মৃত্যুতে আমরা যে একজন বহুগুণবিশিষ্ট, মহামান্য সহযোগী এবং বন্ধু হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, এবং সাধারণে যে, একজন ন্যায়পর, সুপণ্ডিত, পারদর্শী ও সত্যনিষ্ঠ বিচারপতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, এরূপ কথা হাইকোর্টের উভয় সাইডেই আমার সুপণ্ডিত সহযোগী বিচারপতিরা প্রয়োগ করিবেন। যখন এদেশীয়গণের মধ্যে একজনকে এই আদালতের বিচারকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবের বিবেচনা করা হয়, তখন বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিতের যোগ্যতা, সাধুতা, বহুদর্শিতা প্রভৃতি গুণ সমূহে

তাঁহাকেই ঐ পদের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তাঁহার নিয়োগের পর, তাঁহার সারল্য, দয়া এবং সৌজন্যগুণে তিনি যেমন তাঁহার সহযোগি-দিগের প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন, সেইরূপ ঐ সকল গুণে তাঁহার অন্যবিধ যোগ্যতারও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল।”

অপরাপর এজলাসের বিচারপতিগণও উপরি উক্ত রূপ বক্তৃতা করিয়া সকলেই সে দিবস আদালত বন্ধ করেন। জজ বেলি এরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন যে, বাস্তবিক তাঁহার অশ্রুপাত হইয়াছিল। হাইকোর্ট বন্ধ হইলে গবর্নমেণ্ট উকিল কৃষ্ণকিশোর ঘোষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রায় দুইশত ভদ্রলোক মৃতদেহের সঙ্গে শব দাহের ঘাট পর্য্যন্ত গমন করেন। তাঁহার চরিত্র, কার্য্য-ক্ষমতা ও সাধারণ গুণ সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারপতি-গণ যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তদতিরিক্ত আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার যে সকল গুণ কার্য্য স্থলে প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, কেবল বন্ধুজন ও পরিজনের মধ্যেই প্রকাশ পাইত, এখন সেই সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে।

স্নেহ, সৌজন্য, প্রণয়তৃষ্ণা, অমায়িকতা সকল অবস্থাতে এবং সকল সময়েই তাঁহার চরিত্রে প্রকাশ পাইত। পুত্র কলত্রাদির ত কথাই নাই, কুটুম্বমাত্রেই

তাঁহার নিজ পরিজনের ন্যায় সযত্নে ও সস্নেহে প্রতি-পালিত হইত। তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন এবং নিজে সামান্য লোকের অবস্থায় থাকিতেন বটে, কিন্তু আত্মীয় স্বজনের ভরণপোষণে এবং সদ্বিষয়ে দানাদিতে তাঁহার সকল টাকাই খরচ হইয়া যাইত। এই বিষয়ে মাসে তাঁহার দুই হাজার টাকা খরচ হইত। তিনি আপন সন্তানাদির জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, কেবল তাহাতে তাঁহাদের ভদ্র লোকের মত চলিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি বন্ধুবর্গকে উত্তমরূপে আহারাদি করাইতে এবং অতিথি সেবায় অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। একবার কাহার সহিত বন্ধুত্ব হইলে তাহা চিরকাল মনে রাখিতেন। প্রথমাবস্থা ও সামান্যাবস্থার পরিচিত বন্ধুগণকে দেখিলে যত সন্তুষ্ট ও তাঁহাদের সমাদর করিতে যত ব্যস্ত হইতেন, সম্ভ্রান্ত মিত্রগণের দর্শনে তত ব্যস্ত হইতেন না। ডিক্রিজারির মোহরের অবস্থা হইতে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাব সমান বিনীত ছিল। তিনি এত শিষ্টাচারী ছিলেন, ভৃত্যদিগকেও ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নিতান্ত ব্যগ্রতার সময়েও কোন দ্রব্য চাহিতে হইলে, "দেও ভাই" "দেও জি" ভিন্ন কেহ কখন 'দে' বলিতে শুনে নাই। তিনি যাবজ্জীবন কাহার সহিত অপ্রীতিকর বা কষ্টকর ব্যবহার করেন নাই। সকলের নিকট নির-

পরাধী থাকাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন কোন বন্ধু, চিকিৎসকপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলে, বন্ধুর হস্ত ধরিয়া কাতরস্বরে কহিলেন,—'প্রাণ যাউক, তথাপি যেন মান রক্ষা হয়। মরিবার সময় যেন কাহার মনে কষ্ট দেওয়া না হয়।' নিয়োজিত চিকিৎসকেরা জবাব দিয়া গিয়াছেন জানিতে পারিলে তবে অন্য চিকিৎসক ডাকিতে অনুমতি করেন। তথাপি পুনঃ পুনঃ বলিয়া ছিলেন,—'কেহ যেন আমার উপর কষ্ট না হন।"

পাঠকগণ দেখুন! তাঁহার কয়েকটী গুণ পাশাপাশি করিয়া দেখুন! শম্ভুনাথের চরিত্র কেমন অদ্ভুত! এক দিকে শিশুর সারল্য,—অন্যদিকে বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য; এক দিকে অসাধারণ ক্ষমতা,—অন্যদিকে অকপট নম্রতা; একদিকে ঐশ্বর্য্য,—অন্যদিকে দীনভাব; একদিকে বহুলোকের সহিত আলাপ,—অন্যদিকে সকলেরই প্রণয় লাভ; একদিকে অসামান্য পাণ্ডিত্য,—অন্য দিকে চিত্তরঞ্জক সুসামাজিকতা। এতাদৃশ বিসদৃশ গুণ-গ্রামের একাধার প্রায় দেখা যায় না।

তিনি একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ছিলেন। ভবানীপুরব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতিত্ব, তিনিই করিতেন। ধর্ম্ম বিষয়িনী চিন্তা ও আলোচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে কথা কহিতেন, অন্যত্র প্রায়ই নীরব

থাকিতেন। তিনি ব্রিটীস ইণ্ডিয়ান সভায় সভ্যভাবে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু সে স্থলে কেহ তাঁহাকে প্রায়ই কথা কহিতে দেখিতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত। সংস্কৃত সাহিত্যে (M. A.) পরীক্ষা দিয়াছেন। তিনিও "পিতার" উপযুক্ত পুত্র হইয়া এখন হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন।